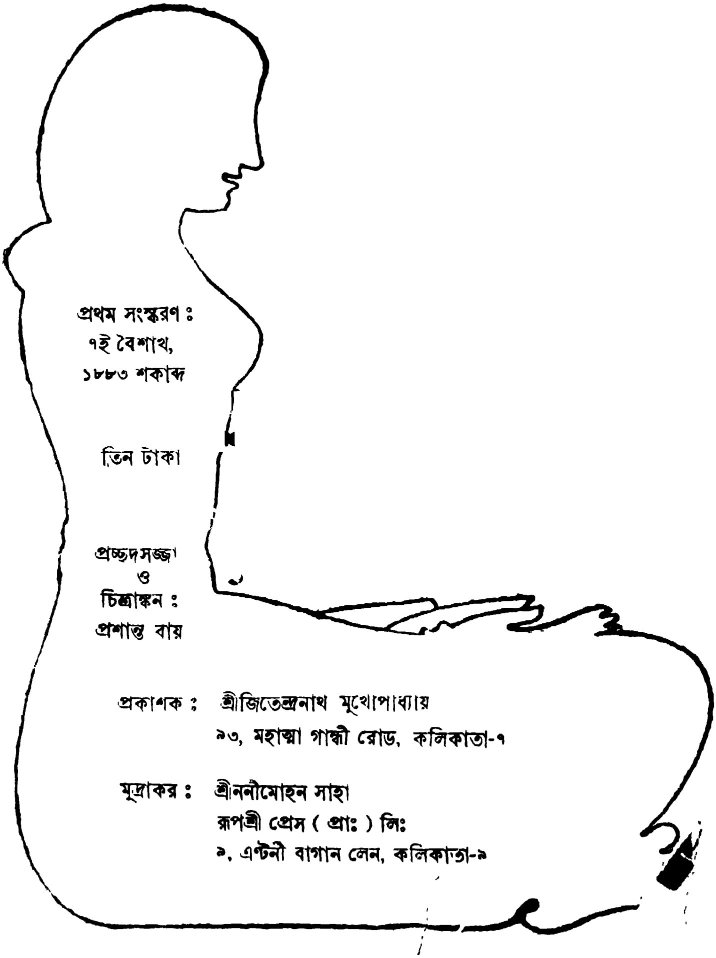
মহাভারত

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭



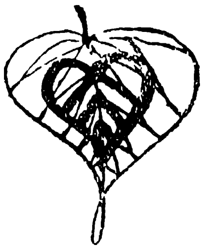
প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই বৈশাখ,
১৮৮৩ শকাব্দ

তিন টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা
ও
চিত্রাঙ্কন ঃ
প্রশান্ত রায়

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৯, এণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯





পরাস্ত হতে হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে—দীর্ঘকাল ভোগ করতে হয়েছে শরশয্যার যন্ত্রণা ; দ্রোণকে প্রাণ হারাতে হয়েছে মিথ্যা ছলনার জালে বাঁধা পড়ে—নির্বংশ হতে হয়েছে তাঁকে তাঁর একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামার দুষ্কর্মের ফলে ; আর, মহাবীর কৃপাচার্য ত একটি দিনের জন্যেও সেনাপতি হতে পারেননি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে—অসাধারণ শৌর্যশালী হয়েও কোন মর্যাদা পাননি তিনি।

মহাভারতের চরিত্রগুলি যদি বৈদূর্যমণির সমতুল্য হয়, তবে তার বিভিন্ন উপদেশ ও নীতিকাহিনী—বিশেষ করে যুধিষ্ঠিরকে প্রদত্ত ভীষ্মের উপদেশাবলী নীলকান্তমণির সমান। দেশব্যাপী ঘোর দুর্ভিক্ষের দিনে মহামুনি বিশ্বামিত্রের চৌর্যবৃত্তি ও অখাদ্য ভোজনের কাহিনী, রাজধর্মাদি সম্বন্ধে ভীষ্মের উপদেশ, প্রভৃতি এমন বাস্তবধর্মী এবং এমন চিরন্তন বর্ণসুষমায় রঞ্জিত যে, আজকালকার উগ্র কমিউনিস্টও বিস্ময়াভিভূত হবেন। যুধিষ্ঠিরকে বলছেন ভীষ্ম: "যে রাজ্যে বালকেরা স্বাদু খাদ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু খেতে পায় না,... প্রজারা ক্ষুধায় অব ... অপহৃতা হয়, সে রাজার জীবনে ধিক্। যে রাজা ... না, বলপ্রয়োগে তাদের ধনহরণ করেন, সেই নির্দয় ... একত্র হয়ে হত্যা করুক। যিনি প্রজারক্ষার আশ্বা ... সেই রাজাকে খেপা কুকুরের ন্যায় হত্যা করা উচিত ...

এ হেন ব্য ... বাঙালীর পরিচয় প্রধানতঃ কাশী-দাসের মাধ্যমে ... সিংহের কাছেও বাঙালী চিরকাল ঋণী থাকবে। ... এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কিশোরবয়স্ক ... উপস্থিত করানর কোন চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয়নি। ... এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। গ্রন্থখানি কিশোরদের স... ধন্য মনে করব।

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

গোপালপু...
পৌষ, ১৩...

আদিপর্ব

পরীক্ষিতের মৃত্যু

আজ থেকে হাজার চারেক বছর আগের কথা।

এখন যেখানে ভারতের রাজধানী দিল্লী, তারই কাছাকাছি ছিল সেকালের এক বিশাল রাজ্যের রাজধানী—হস্তিনাপুর।

ঐ রাজ্যে তখন রাজত্ব করতেন ক্ষত্রিয় রাজা পরীক্ষিৎ। মহারাজচক্রবর্তী ভরতের বংশে জন্ম তাঁর। রাজা ভরতের নাম থেকেই এ দেশের নাম হয়েছে: ভারতবর্ষ। ভরতের পরে তাঁর কুলে আরেকজন চক্রবর্তী রাজা হন, তাঁর নাম: কুরু। মহারাজ কুরুর নাম থেকে ঐ বংশের নাম হয়: কুরুবংশ।

মস্ত রাজা ছিলেন পরীক্ষিৎ। যেমন তাঁর ধর্মে মতি, তেমনি দান-ধ্যান আর সুশাসন; তাছাড়া, পরাক্রমের ত কথাই নেই।

জ পরীক্ষিতের বয়স এখন ছিয়ানব্বই ব



তীরে, সে পাথরের পিছনে। কিন্তু কোথাও তিনি দেখতে পেলেন না মৃগটিকে। অবশেষে পূবের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার উদ্যোগ করল।

এমন সময়ে এক মুনিকে দেখতে পেলেন পরীক্ষিৎ। তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "মুনিবর, আপনি কি এ পথ দিয়ে একটা আহত হরিণকে ছুটে পালাতে দেখেছেন?"

পরীক্ষিতের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না মুনি। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর আবারও। তবুও রা নেই মুনির মুখে, পাথরে খোদাই-করা মূর্তির মত তিনি বসে রইলেন—নীরব, নিশ্চল!

এতে পরীক্ষিৎ বেজায় চটে গেলেন মুনির উপরে। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল একটা মরা সাপ। কি যে খেয়াল হল তাঁর, ধনুকের ডগা দিয়ে সাপটাকে তুলে এনে ঝুলিয়ে দিলেন মুনির কাঁধে। তারপর ফিরে গেলেন রাজধানী হস্তিনাপুরে।

ঐ মুনির নাম শমীক। মুনির মত মুনি তিনি—ক্রোধ নেই, দ্বেষ নেই, লোভ নেই, নেই নিজের সুখের জন্য কোন চিন্তা। ... ভগবানের ধ্যান করছেন, আর ভাবছেন ...



অভিশাপ দিলেন ঃ "যে দুষ্ট আমার নিরীহ পিতাকে এমন করে অপমান করেছে, আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে মহাবিষধর তক্ষক-নাগের দংশনে প্রাণ হারাবে সে।"

শৃঙ্গীর দেওয়া শাপের কথা শুনে হায় হায় করে উঠলেন শমীক। মাটির মতই মহৎ ছিলেন তিনি। মানুষ মাটিকে কোপায়, পায়ে দলে,—মাটি তবু সেই মানুষকেই বাঁচাতে খাদ্য জোগায়। শমীকও রাজাকে শাপ থেকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর শিষ্য গৌরমুখকে পাঠিয়ে দিলেন হস্তিনাপুরে, যাতে রাজা আগে থেকে শাপের কথা শুনে সাবধান হন।

গৌরমুখের মুখে শাপের কথা শুনে ভারী কাতর ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন পরীক্ষিৎ। মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি একটি উঁচু থামের উপরে এক প্রাসাদ তৈরী করালেন। সাপ ঢোকার কোন পথ রইল না তাতে—এমনি নিশ্ছিদ্র সে প্রাসাদ। তারপর সেই প্রাসাদে গিয়ে তিনি বাস করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে রইল বহু মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও বিষবৈদ্য। ঐ ব্রাহ্মণদের মন্ত্রের জোরে কোন সাপ কাছ ঘেঁষতে পারত না, আর বিষবৈদ্যদের চিকিৎসা-গুণে সাপের কামড়ে মরা মানুষও বেঁচে উঠত।

এদিকে তক্ষক-নাগ পড়ল বিষম চিন্তায়। যেমন করেই হোক, ব্রাহ্মণের মুখরক্ষা করতে হবে তাকে—রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করতেই হবে। অবশেষে একটি উপায় ঠাওরাল সে। কয়েকটি বাছা বাছা সাপকে সে ডেকে আনল। তারা তপস্বীর বেশ ধরে চলল রাজাকে ফল উপহার দিতে। তক্ষক ধরল ছোট একটা কীটের ছদ্মবেশ—ঐ ফলগুলির একটির মধ্যে লুকিয়ে রইল সে।

দিন শেষ হয়ে এসেছে। আজকের রাতটা ভালয় ভালয় কেটে গেলেই শৃঙ্গীর শাপ থেকে নিস্তার পাবেন পরীক্ষিৎ। সবাই

ভাবতে আরম্ভ করেছে ঃ এখন কলিযুগ—ঋষিবাক্যের আর সে তেজ নেই, শৃঙ্গীর শাপও ফলবে না—রাজাও মরবেন না।

রাজা কিন্তু ভাবছেন অন্য কথা—ভাবছেন ঃ ঋষিবাক্য যদি মিথ্যা হয়, তবে ত পাপে ডুবে যাবে পৃথিবী—মানুষ বেপরোয়া হয়ে দুষ্কর্ম করতে আরম্ভ করবে ; মানুষের এমন সর্বনাশ হওয়ার চেয়ে তাঁর সর্পদংশনে মৃত্যুও ঢের ভাল।

সূর্য ডুবু-ডুবু। পশ্চিমাকাশে যেন আগুন লেগেছে, আর পূব-আকাশে জাগছে সাঁঝের কাল। এমন সময়ে তপস্বীবেশী নাগেরা ফল নিয়ে এল রাজার কাছে। রাজা ফলগুলি রেখে তাদের বিদায় দিলেন।

তারপর রাজা পরীক্ষিৎ তাঁর লোকজনদের নিয়ে খেতে আরম্ভ করলেন সেই ফল। সেই ফলগুলির একটির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কীটরূপী তক্ষক—রাজার মরণদূত। পরীক্ষিৎ দুটি আঙুল দিয়ে কীটটিকে তুলে নিলেন, তারপর সেটিকে নিজের কণ্ঠদেশে রেখে বললেন ঃ "হে কীট, তুমি তক্ষক হয়ে দংশন কর আমাকে। ঋষিবাক্য সত্য হোক—মৃত্যু হোক আমার—রক্ষা হোক পৃথিবীর ধর্ম।"

অমনি স্বমূর্তি ধারণ করল তক্ষক। রাজাকে দংশন করে ভীম গর্জন করতে করতে সে গিয়ে উঠল আকাশে, তারপর উধাও হয়ে গেল। সেকালে উড়তে পারত সাপেরা।

এই ভাবে পৃথিবীর ধর্মরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জন দিলেন মহাপ্রাণ রাজা পরীক্ষিৎ।

জন্মেজয়ের যজ্ঞ

রাজা পরীক্ষিতের যখন মৃত্যু হল, তখন তাঁর ছেলে জন্মেজয় ছিলেন নিতান্ত শিশু। মন্ত্রীরা তাঁকেই সিংহাসনে বসালেন, এবং তাঁর হয়ে সাবধানে নিজেরা রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। ক্রমে জন্মেজয় বড় হলেন, নিজ রাজ্যের ভার নিজেই নিলেন। তাঁর পিতার যে কি ভাবে মৃত্যু হয়েছিল, সে কথা কিন্তু তাঁকে জানান হয়নি।

জন্মেজয় ছিলেন দিগ্বিজয়ী রাজা। নানা দেশ জয় করেছিলেন তিনি।

সেবার তক্ষশীলা জয় করে সবে রাজধানীতে ফিরে এসেছেন জন্মেজয়। রাজ্যময় চলেছে আনন্দোৎসব—নিশান উড়ছে, বাজি পুড়ছে, ফুলে আর প্রদীপে মঙ্গলঘটে আর আম্রপল্লবে সাজান হয়েছে ভবনগুলি, নাচ চলেছে, গান চলেছে, চলেছে রাজবাড়িতে অবিশ্রাম দু হাত ভরে দান। সভা জাঁকিয়ে বসেছেন বিজয়ী রাজা জন্মেজয়। এমন সময়ে সেই সভায় এসে উপস্থিত হলেন উতঙ্ক নামে এক ব্রাহ্মণ।

তক্ষক-নাগ একবার উতঙ্ককে বড় বিপাকে ফেলেছিল। তাই তক্ষকের উপর ভীষণ রাগ ছিল উতঙ্কের। ঐ দুষ্ট সাপটাকে শাস্তি দেবার জন্যই তাঁর হস্তিনাপুরে আসা।

উতঙ্ক বললেন জন্মেজয়কে : "মহারাজ, এ কি করছেন আপনি? ছেলেমানুষের মত আসল কাজ ফেলে রেখে যত বাজে কাজ করে চলেছেন!"

মহারাজ ত অবাক্! বললেন : "সেকি কথা! আমি কোন্ কাজ ফেলে রেখেছি, ঠাকুর?"

"আসল কাজই ফেলে রেখেছেন—সব চেয়ে বড় কাজ,—আপনার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেননি, মহারাজ।"

"আমার পিতৃহত্যা!" আরও অবাক্ হন জন্মেজয়। "কে হত্যা করেছে, তাঁকে ঠাকুর?"

উতঙ্কও বিস্মিত হন, বলেন: "কেন, আপনি কি তা জানেন না, মহারাজ? তক্ষক-নাগের দংশনে যে আপনার পিতা মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রাণ হারিয়েছেন। আপনার বৃদ্ধ মন্ত্রীরা ত স্বচক্ষে সমস্ত ঘটনা দেখেছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করুন—সব জানতে পারবেন।"

জন্মেজয় মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করে তাঁর পিতার মৃত্যু-বিবরণ শুনলেন। শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন তিনি। সে ক্রোধ শুধু তক্ষকের উপর নয়—সমগ্র সর্পজাতির উপর। জন্মেজয় প্রতিজ্ঞা করলেন: সর্পবংশ ধ্বংস করবেন।

বিষম প্রতিজ্ঞা! পৃথিবীতে সাপ ত আর একটি-দুটি নয়—কোটি কোটি। এই অসংখ্য সাপ বিনাশ করা কি সম্ভব! অথচ, রাজা যখন প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন ত তা রক্ষা করতেই হবে, নইলে মান থাকে না কুরুবংশের—মান থাকে না হস্তিনার। পুরোহিত মন্ত্রী পাত্রমিত্র সবাই ভারী দুশ্চিন্তায় পড়লেন—এমন কি, স্বয়ং মহারাজও।

রাত্রিদিন ধরে পণ্ডিত আর জ্ঞানীরা ভাবতে লাগলেন: কি করে সর্পকুল ধ্বংস করা যায়? অবশেষে উপায় খুঁজে বার করলেন রাজপুরোহিতেরা। অনেক আলোচনা করে অনেক শাস্ত্রপুঁথি ঘেঁটে তাঁরা জানতে পারলেন সর্পসত্রের কথা।

সর্পসত্র হল এক রকম বড় যজ্ঞ। শাস্ত্রে আছে: এ যজ্ঞ করে আহুতি দিলে সাপেরা আপনা থেকে ছুটে আসবে—ঝাঁপিয়ে পড়বে যজ্ঞকুণ্ডের আগুনে—প্রাণ হারাবে।

ব্যস্! রাজা জন্মেজয় অমনি হুকুম দিলেনঃ "সর্পসত্রের আয়োজন কর।"

সঙ্গে সঙ্গে রাজপুরুষেরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রাজকোষের কপাট গেল খুলে। দিকে দিকে পাঠান হল আদেশ-উপদেশ আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ। প্রকাণ্ড এক যজ্ঞস্থান তৈরী হল, তাতে সব বিরাট্ বিরাট্ যজ্ঞকুণ্ড। দেশবিদেশ থেকে এলেন বড় বড় ঋষি সে যজ্ঞে পুরোহিত হতে। আব এল নৈবেদ্যের চাল, হোমের ঘি, যজ্ঞাগ্নির জন্য অরণিকাষ্ঠ; তাছাড়া, দানের সামগ্রী, ফলমূল,—আরও কত কি!

আরম্ভ হল সর্পসত্র। ধূপধুনার ধোঁয়ায় যজ্ঞস্থান আঁধার হয়ে গেল, পুরোহিতদের মন্ত্রপাঠের গম্ভীর ধ্বনিতে চারদিক্ গম্‌গম্ করতে লাগল, যজ্ঞাগ্নির শিখা গিয়ে ঠেকল আকাশের গায়ে। আর, পুরোহিতেরা যেই সে আগুনে আহুতি দিতে আরম্ভ করলেন, অমনি লাখো লাখো সাপ কাল মেঘের মত দিনের আলো ঢেকে দিয়ে ঝড়ো বাতাসের মত ফোঁস্‌ফোঁস্ করতে করতে আকাশ-পথে উড়ে আসতে লাগল—স্বেচ্ছায় যজ্ঞকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ হারাল।

তক্ষক-নাগও মন্ত্রেব টানে যজ্ঞকুণ্ডের দিকে উড়ে আসতে লাগল। এমন সময়ে—

আস্তীকমুনি ছিলেন সর্পরাজ বাসুকির ভাগনে—সেই সুবাদে গোটা সর্পজাতির কুটুম্ব। আস্তীক বয়সে নবীন, কিন্তু জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে পরম প্রবীণ। জন্মেজয়ের যজ্ঞে অহিকুল নির্মূল হবার উপক্রম করেছে দেখে ভাগনের কথা মনে পড়ল নাগরাজের। প্রধান প্রধান ফণীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আস্তীকের শরণাপন্ন হলেন। মহামুনি তাঁর মাতুলকে অভয় দিয়ে চললেন জন্মেজয়ের কাছে।

সর্পযজ্ঞের কুণ্ডে শেষ আহুতি দিতে উদ্যত হয়েছেন পুরোহিত। আকাশ-পথে ছুটে আসছে তক্ষক—আর রক্ষা নেই, এখনি যজ্ঞকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ হারাতে হবে তাকে। এমন সময়ে আস্তীক এসে উপস্থিত হলেন যজ্ঞস্থানে। ঊর্ধ্বে আকাশে তক্ষকের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন: "তিষ্ঠ—তিষ্ঠ—তিষ্ঠ" অর্থাৎ থাম—থাম—থাম। তক্ষক আকাশে থেমে রইল। আস্তীক তখন জন্মেজয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন: "মহারাজ, ভিক্ষা চাই কিছু।"

ভারী সুন্দর মুখখানা আস্তীকের—যেন সূর্যের আলো আর চাঁদের জোছনা একত্রে মিশেছে তাতে! তাঁর কণ্ঠস্বর যেমন গম্ভীর, তেমনি মধুর। দৃষ্টিতে তাঁর তেজও প্রচুর, করুণাও অঢেল।

আস্তীককে দেখে মুগ্ধ হলেন জন্মেজয়, বললেন: "ব্রাহ্মণকে অদেয় আমার কিছুই নেই। বল, মুনিঠাকুর, তোমার কি চাই?"

"সর্পসত্র বন্ধ করুন, মহারাজ। এই আমার একমাত্র প্রার্থনা" বললেন মহামুনি আস্তীক।

সত্যসন্ধ রাজা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। বন্ধ হল সর্পসত্র—রক্ষা পেল তক্ষক ও সর্পবংশ।

এমনি করে সর্পযজ্ঞ পণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু এই যজ্ঞের ফলে পৃথিবীর সেরা গ্রন্থখানির প্রচার হল। গ্রন্থখানি হল একখানি মহাকাব্য, নাম: মহাভারত। কুরুবংশের অর্থাৎ জন্মেজয়ের পূর্ব-পুরুষদের কাহিনী নিয়ে সেখানা রচনা করেছিলেন মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। লক্ষ শ্লোক ছিল তাতে।

সর্পযজ্ঞের যখন উদ্যোগ চলছিল, তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এসেছিলেন জন্মেজয়ের সভায়। রাজা তাঁকে অনুরোধ করেন মহাভারত

শোনাতে। কিন্তু মুনির সে অবসর ছিল না। তিনি তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়নকে আদেশ দেন রাজাকে মহাভারত শোনাতে। নিত্য সর্পসত্রের ফাঁকে ফাঁকে বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে মহাভারত শোনান।

এবারে শোন সেই মহাভারতের কাহিনী—ভারতবর্ষের অনুপম গর্ব পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ্ মহাভারত।

ভীষ্মের

ভারী অস্থির হয়ে পড়েছেন রাজা শান্তনু। সারা রাতের মধ্যে একবারও তিনি চোখের পাতা এক করতে পারেননি, বিছানায় শুতে পারেননি পর্যন্ত—ফুলের মত কোমল বিছানা কাঁটার মত বিঁধেছে তাঁকে!

মহারাজচক্রবর্তী রাজা কুরুবংশধর শান্তনু। রাজার রাজা তিনি—সম্রাট্। হস্তিনার সিংহাসনে বসে তিনি গৌরব বাড়িয়েছেন ভরতবংশের। বড় বড় রাজারা তাঁর সামনে এসে মাথা নোয়ান—কত রাজমুকুট লোটায় তাঁর পায়ের তলায়। কত সৈন্যসামন্ত তাঁর, কত ধন-সম্পদ্! কোন ঐশ্বর্যেরই তাঁর অপ্রতুল নেই। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তাঁর সুশাসন আর বীরত্বের খ্যাতি। দেবতারা পর্যন্ত সমাদর করেন তাঁকে। তবু, মনে তাঁর সুখ নেই।

রাজরানী গঙ্গাদেবী একে-একে সাত ছেলের মা হয়েছিলেন। ছেলে ত নয়—সব যেন দেবশিশু। ঘর আলো-করা রূপ তাদের, কিন্তু রাজা শান্তনু ছেলেদের খানিক যা চোখেই দেখেছেন—একবার বুকে ধরার সুযোগও পাননি; কারণ, যেই একটি ছেলে জন্মেছে, অমনি রানী তাকে কোলে তুলে নিয়ে গঙ্গাতীরে গেছেন এবং শিশুটিকে নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়ে ফিরে এসেছেন রাজপুরীতে!

এমনি করে একে একে সাত-সাতটি ছেলেকে মেরেছেন সম্রাজ্ঞী গঙ্গা। এ কি মা, না রাক্ষসী, না উন্মাদিনী! দুঃখে রাজা শান্তনুর অন্তর ছেয়ে গেছে—কখনও বা মহাক্রোধে জ্বলে উঠেছেন তিনি, তবু গঙ্গাকে বাধা দেবার সাহস হয়নি তাঁর। এর একটু কারণ আছে।

শান্তনু তখন যুবক। একদিন তিনি গঙ্গাতীরে বেড়াচ্ছিলেন একা একা। এমন সময়ে একটি কন্যাকে তিনি দেখতে পেলেন। অপরূপ রূপবতী কন্যাটি। কাল মেঘের ঢল নেমেছে তার হাঁটু-ছোঁওয়া চুলগুলি বেয়ে, ভোরের নরম রোদও ম্লান হয়ে যায় তার গায়ের রঙের কাছে, হরিণীর মত টানা-টানা কাল চোখ দুটিতে তার আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা, তার পায়ে পায়ে ঘাসের বুকে পদ্ম ফুটছে যেন!

শান্তনু মেয়েটিকে দেখেন আর অবাক্ হন, ভাবেন: কে এ—কোন ছদ্মবেশিনী দেবী নয় ত? মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি, তাকে বিয়ে করতে চাইলেন।

মেয়েটি বলল: "মহারাজ, আমি দেবকন্যা। আমার নাম গঙ্গা। আপনাকে আমি বিয়ে করতে রাজী আছি তবে এক শর্তে।"

কি শর্ত? না, বিয়েব পর মেয়েটির কোন কাজে বাধা দেবেন না শান্তনু, তিরস্কার করবেন না,—এমন কি, কেন যে সে কাজ সে করেছে, তা জানতে পর্যন্ত চাইবেন না। শান্তনু যদি এ শর্ত ভাঙেন, তাহলে তখনি মেয়েটি রাজাকে ছেড়ে চলে যাবে চিরদিনের মত।

ঐ শর্ত মেনে নিয়েই গঙ্গাদেবীকে বিয়ে করেন রাজা শান্তনু। আর, তাই আজ গঙ্গা নৃশংসভাবে সাত-সাতটি ছেলেকে মেরে ফেললেও শান্তনু তাঁকে বাধা দিতে সাহস পাননি—পাছে শর্ত ভাঙে, পাছে গঙ্গাদেবী তাঁকে ছেড়ে চলে যান।

এবার অষ্টম সন্তানের পালা। এটিকেও কি অমন করে মারবেন গঙ্গা? সারা রাত ধরে এই কথাই ভাবছিলেন শান্তনু। ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে পাগলের মত হয়ে উঠলেন তিনি—ছুটে চললেন আঁতুড়ঘরে।

আঃ! ঐ যে গঙ্গাদেবী আতুড়ঘরে বসে। কোলে তাঁর সদ্যোজাত ছেলে। এ ছেলেটি যেন আগের সাতটির চেয়েও ঢের বেশী সুন্দর—ঢের বেশী সুলক্ষণ।

দরজার কপাটের আড়াল থেকে পুত্রকে দেখে মুগ্ধ হলেন শান্তনু—তাঁর চোখের পলক আর পড়ে না।

হঠাৎ গঙ্গাদেবী ছেলের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তা দেখে দুরুদুরু করে উঠল শান্তনুর বুক! তিনি ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন রানীর সামনে, বললেনঃ "গঙ্গা—গঙ্গা, এটিকেও মেরো না, রাক্ষসী, মেরো না," কান্না চাপতে গিয়ে রাজার গলার স্বর আটকে গেল।

গঙ্গাদেবী মাথা তুলে রাজার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। সে হাসি ভারী মধুর—ভারী ভয়ঙ্কর! রানী বললেনঃ "মহারাজ, শর্ত ভাঙলে তুমি। সুতরাং, এখুনি আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব। মা হয়ে নিজের হাতে সন্তানদের মেরেছি বলে তুমি আমাকে 'রাক্ষসী' বললে, কিন্তু জান না'ত, মহারাজ, কেন মেরেছি। এবার শোন সেই কাহিনী।"

গঙ্গা বলতে লাগলেনঃ "স্বর্গে অষ্টবসু নামে আট ভাই দেবতা আছেন। একদিন তাঁরা তাঁদের পত্নীদের নিয়ে বেড়াতে যান বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে। মুনি তখন আশ্রমে ছিলেন না। আশ্রমে ছিল বশিষ্ঠের গাভী—নন্দিনী। নন্দিনী হল কামধেনু,—তার কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। বসুদের এক ভাইয়ের নাম

হ্যু। নন্দিনীকে দেখে দ্যু-বসুর স্ত্রীর ভারী লোভ হল। তাঁর পীড়াপীড়িতে বসুরা চুরি করে নিয়ে গেলেন নন্দিনীকে।

এদিকে বশিষ্ঠ আশ্রমে ফিরে দেখেন, নন্দিনী নেই। ধ্যান করে তিনি জানতে পারলেন বসুদের অপকর্মের কথা। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন : বসুরা মানুষ হয়ে জন্মাবেন পৃথিবীতে।"

শান্তনু স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলেন গঙ্গার কথা। সাগ্রহে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : "তারপর ?"

গঙ্গাদেবী বললেন : "বশিষ্ঠের দেওয়া অভিশাপের কথা হাওয়ায় ভেসে পৌঁছল বসুদের কানে। তখন ভারী মুষড়ে পড়লেন তাঁরা। সুখের স্বর্গ ছেড়ে কি করে তাঁরা গিয়ে বাস করবেন দুঃখের পৃথিবীতে ? বশিষ্ঠের কাছে গিয়ে কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন তাঁরা। তাঁদের কান্নায় মুনির অন্তর গলে গেল। বললেন তিনি : অভিশাপ ত আর ফেরান যাবে না—মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মাতেই হবে বসুদের, তবে জন্মমাত্রই তাঁদের মৃত্যু হবে—তখন তাঁরা আবার ফিরে আসবেন স্বর্গে ; কেবল দ্যু-বসু নিজের হাতে নন্দিনীকে চুরি করেছিলেন বলে দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকবেন।"

এই কাহিনী শেষ করে রানী বললেন : "মহারাজ, আমি গঙ্গাদেবী—বসুদের মুক্তি দেবার জন্য মানবীর বেশে বিয়ে করেছিলাম তোমাকে। স্বর্গের অষ্টবসুই তোমার আট ছেলে। আর ইনি হলেন দ্যু-বসু। এঁকে অনেক দিন মানুষ হয়ে বাস করতে হবে পৃথিবীতে। এখন এঁকে আমি নিয়ে যাচ্ছি—বড় করে মানুষ করে আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

এই বলে ছেলেটিকে নিয়ে অন্তর্ধান করলেন গঙ্গাদেবী।

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা

হস্তিনাপুর আঁধার করে শান্তনুর সকল সুখ-শান্তি হরণ করে গঙ্গাদেবী চলে গেলেন।

দিনের পর দিন কাটে। রাতের পর ভোর হয়, শীতের পর বসন্ত আসে—পাতা-ঝরা গাছে নতুন পাতা গজায়, পালিয়ে-যাওয়া কোকিল আবার ফিরে আসে হস্তিনার গাছে গাছে। কিন্তু রাজা শান্তনুর মনে শান্তি আর ফেরে না।

একদিন মনের দুঃখে একা একা গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন শান্তনু। হঠাৎ দেখলেন: একটি ছেলে তীর-ছোড়া অভ্যাস করছে। তীর-ছোড়ায় আশ্চর্য দ' ছেলেটির—বাণে বাণে গোটা গঙ্গানদী ছেয়ে ফেলেছে সে। রাজাকে দেখতে পেয়েই ছেলেটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছেলেটিকে দেখে শান্তনুর বুকের ভিতরটা টন্‌টন্ করে উঠল। তাঁর মনে হল: ছেলেটি যেন তাঁরই—সেই যাকে নিয়ে গঙ্গাদেবী চলে গিয়েছিলেন। গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে কাতরকণ্ঠে বলে উঠলেন শান্তনু: "গঙ্গা—গঙ্গা, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও,—আমি যে আর একা থাকতে পারি না।"

সঙ্গে সঙ্গে দেবী গঙ্গা ঐ ছেলেটির হাত ধরে রাজার সামনে এসে উপস্থিত হলেন, বললেন: "এই নাও, মহারাজ, তোমার ছেলে। এর নাম রেখেছি: দেবব্রত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ্ পরশুরাম যত রকম অস্ত্রচালনা জানেন, এও তা জানে; দেবগুরু বৃহস্পতি আর দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য যত শাস্ত্র জানেন, সে সমস্ত ওর কণ্ঠস্থ।" এই বলে দেবব্রতকে রেখে গঙ্গাদেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাজা মহানন্দে ছেলেকে নিয়ে রাজপুরীতে ফিরে এলেন।

কুমার দেবব্রত—যেমন তাঁর রূপ তেমনি গুণ, যেমন বিদ্যা তেমনি বুদ্ধি, যেমন শক্তি তেমনি সাহস। সারা রাজ্যময় কুমারের জয়-জয়কার—স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে তাঁর খ্যাতি। রাজা শান্তনু দেবব্রতকে যুবরাজ করে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

এর চার বছর পরে শান্তনু একদিন যমুনা-নদীর তীরে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি একটা ভারী মধুর গন্ধ পেলেন। কোথা থেকে ঐ গন্ধ আসছে, তা খুঁজতে খুঁজতে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখলেন: পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে খেয়া-নৌকা বাইছে, আর তারই দেহ থেকে বেরুচ্ছে ঐ মন-মাতান সুগন্ধ। রাজা মেয়েটির পরিচয় নিলেন—নাম তাব সত্যবতী, সে হল দাসরাজের মেয়ে।

সেকালে ভারতবর্ষে দাসেরা ছিল মস্ত জাতি। মাছ-ধরা ও নৌকা-বাওয়া ছিল তাদের পেশা। বিক্রমে মর্যাদায় তারা ভারতের একটা প্রধান জাতি ছিল। সত্যবতী ছিলেন দাসরাজের পালিতা কন্যা।

শান্তনু দাসরাজের কাছে গিয়ে সত্যবতীকে বিয়ে করতে চাইলেন। দাসরাজ বললেন: শান্তনুর মত রাজা সত্যবতীকে বিয়ে করবেন, এ ত তাঁর পরম সৌভাগ্য! তবে শর্ত আছে—সত্যবতীকে হস্তিনায় পাটরানী করতে হবে, এবং তার ছেলে হলে সেই ছেলেকেই বসাতে হবে কুরুবংশের সিংহাসনে।

দ্বিতীয় শর্তটি মেনে নিতে পারলেন না শান্তনু। দেবব্রতের মত সর্বগুণধর ছেলেকে ফেলে কি করে অন্যকে সিংহাসন দেবেন তিনি? দুঃখিত মনে তিনি হস্তিনায় ফিরে এলেন।

হস্তিনায় ফিরেও সত্যবতীকে ভুলতে পারলেন না শান্তনু। রাতদিনই তিনি মনমরা হয়ে থাকেন। বাপের অবস্থা দেখে বড়

চিন্তিত হলেন দেবব্রত। শান্তনুকে জিজ্ঞাসা করে তিনি কোন সদুত্তর পেলেন না। অনেক তত্ত্বতলাশ করে অবশেষে তিনি রাজার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারলেন ব্যাপারটা। তখন তিনি পিতাকে কিছু না জানিয়ে কয়েকজন প্রধান প্রধান অমাত্যকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং গেলেন দাসরাজ্যে।

দাসরাজ শান্তনুকে যা বলেছিলেন, এবারও তাই বললেন। তখন দেবব্রত বললেন: "শুনুন, দাসরাজ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি: মা-সত্যবতী হস্তিনার পাটরানী হবেন, আর তাঁর ছেলেই হবে কুরুরাজ্যের রাজা। আমি সিংহাসনের দাবি ছেড়ে দিলাম।"

দাসরাজ অবাক্! বললেন: "যুবরাজ, আপনি ধন্য—মহাপুরুষ আপনি! এমন করে যে কেউ অত বড় রাজপদ ছেড়ে দিতে পারে, তা স্বপ্নেরও অগোচর। জানি, আপনি সত্যবাদী—আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন। কিন্তু, যুবরাজ, আপনারও ত ছেলে হবে—সে নিশ্চয়ই সত্যবতীর ছেলের কাছ থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেবে।"

এ কথায় দেবব্রত বললেন: তবে শুনুন, দাসরাজ, আমার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা: জীবনে কোনদিন বিয়ে করব না আমি—চির-কুমার থাকব; তাহলে আমার ছেলেও হবে না এবং সিংহাসনের জন্যে মা-সত্যবতীর ছেলের সঙ্গে বিবাদও করবে না কেউ।"

এ প্রতিজ্ঞা শুনে উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল দেবব্রতের মাথায়; মেঘের আড়াল থেকে দৈববাণী হল: "মহান্ ত্যাগী কুমার দেবব্রত আজ যে দুই প্রতিজ্ঞা করলেন, এমন ভীষণ প্রতিজ্ঞা স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে আর কেউ কখনও করেনি। মানুষে যা ভাবতে পারে না, দেবতাদের যা অসাধ্য, তেমনি দুই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি। আজ থেকে তাই ওঁর নাম হবে: ভীষ্ম।"

দাসরাজ তখন পরমানন্দে সত্যবতীকে এনে ভীষ্মের হাতে দিলেন। ভীষ্ম সত্যবতীকে বললেন: "রথে উঠুন, মা,—আপনার রাজ্যে চলুন।"

সত্যবতীকে পেয়ে শান্তনু ভীষ্মের উপর অত্যন্ত খুশী হলেন, তাঁকে 'ইচ্ছামৃত্যু'-বর দিলেন। এই বরের জোরে ভীষ্ম তাঁর যত দিন ইচ্ছা বেঁচে থাকতে পারবেন এবং তাঁর ইচ্ছা হলেই তবে মৃত্যু হবে।

কৌরব ও পাণ্ডব

শান্তনুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সত্যবতীর। দুই ছেলে হল সত্যবতীর: চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। শান্তনু মারা গেলে ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে হস্তিনার সিংহাসনে বসালেন।

বহু গুণে গুণী ছিলেন চিত্রাঙ্গদ। কিন্তু, এক ফোঁটা লেবুর রসে যেমন এক হাঁড়ি দুধ কেটে যায়, তেমনি একটি মাত্র দোষে অকালে নষ্ট হয়ে গেল চিত্রাঙ্গদের জীবন। দোষটি হল: অহঙ্কার। তিনি ভাবতেন: তাঁর মত বীর আর কেউ নেই। তাই যখন-তখন যাকে-

বেড়ালে অপমান করা হয় আমাকে। হয় তুমি তোমার নাম পালটাও, নয়ত যুদ্ধ কর আমার সঙ্গে।"

গন্ধর্বরাজ ত রাগে আগুন! কি, মানুষ হয়ে এমন স্পর্ধা! তবে ধর অস্ত্র।

বাধল লড়াই দুজনে। দুজনেই সমান বীর, দুজনেরই সমান অস্ত্রকৌশল। বহুক্ষণ পর্যন্ত কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারলেন না। কিন্তু হাজার হলেও হস্তিনারাজ মানুষ, তাই শেষ পর্যন্ত তিনি মারা গেলেন।

চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পরে হস্তিনার রাজা হলেন বিচিত্রবীর্য। তাঁর হল তিন ছেলে: ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর।

বিচিত্রবীর্যও অল্প বয়সে মারা যান। তাঁর বড় ছেলে ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ। তাই, রাজা হলেন মেজ ছেলে পাণ্ডু। ছোট ছেলে বিদুর ছিলেন পরম ধার্মিক ও সুবুদ্ধি, তিনি হলেন মন্ত্রী।

পেশাওয়ারের কাছাকাছি ছিল গান্ধার-রাজ্য। সে রাজ্যের রাজকন্যা গান্ধারীর সঙ্গে বিয়ে হল ধৃতরাষ্ট্রের। স্বামী অন্ধ বলে সতীলক্ষ্মী গান্ধারী বিয়ের দিন থেকেই কাপড়ের পুরু পটী দিয়ে নিজের চোখ বেঁধে রাখলেন চিরজীবনের মত।

পাণ্ডু বিয়ে করলেন কুন্তীভোজের মেয়ে কুন্তীকে আর মদ্রদেশের রাজভগিনী মাদ্রীকে।

বিদুরের বিয়ে হল দেবকরাজকন্যার সঙ্গে।

দেবতাদের বরে কুন্তীর হল তিন ছেলে, আর মাদ্রীর দুই। যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন—এই তিনজন কুন্তীর ছেলে; মাদ্রীর ছেলে হল নকুল ও সহদেব। ধর্মদেবের বরে জন্মেছিলেন বলে যুধিষ্ঠির ছেলেবেলা থেকেই পরম ধার্মিক হয়ে উঠলেন; বায়ু-দেবতা পবনের বরে জন্মে ভীম হলেন মহাবলশালী; দেবরাজ ইন্দ্রের বরে অর্জুন হলেন সর্বগুণধর মহাবীর; আর, স্বর্গের চিকিৎসক দু ভাই অশ্বিনীকুমারের বর পেয়ে নকুল হলেন অতি রূপবান্ এবং সহদেব

হলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতি। পাণ্ডুর এই পাঁচ ছেলেকে লোকে বলত ঃ পাণ্ডব।

ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারীর হল এক শ ছেলে আর একটি মেয়ে। বড় ছেলে দুটির নাম দুর্যোধন ও দুঃশাসন, মেয়েটির নাম দুঃশলা। ধৃতরাষ্ট্র একটি বৈশ্যজাতির মেয়েকেও বিয়ে করেছিলেন; সেই স্ত্রীর যুযুৎসু নামে একটি ছেলে হয়। কুরুবংশের সন্তান বলে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের বলা হত ঃ কৌরব।

কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে বড় ছিলেন যুধিষ্ঠির, তারপর ভীম, তারপর দুর্যোধন।

রাজা পাণ্ডুও অকালে মারা গেলেন। ছোট রানী মাদ্রী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলেন। আর কুন্তী বেঁচে রইলেন নাবালক পাণ্ডবদের মানুষ করার জন্য। ভীষ্ম ও বিদুরের পরামর্শ নিয়ে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজকার্য চালাতে লাগলেন। কৌরব-পাণ্ডবেরা পিতামহ ভীষ্মের স্নেহে-যত্নে মানুষ হতে লাগলেন। তাঁদের লেখাপড়া আর অস্ত্রবিদ্যা শেখানর ভার পড়ল আচার্য কৃপের উপর।

ভীমের বিষপান

[illegible] সম্পদ, [illegible] র সুখ [illegible]

[illegible] কথা [illegible] রাজা [illegible] করে আর কেহ বা পাণ্ডবদের বলত ঃ রাজপুত্র? তারপর দেখ না, বয়সে বড় হলেও বরং দুর্যোধনের রাজা হওয়ার আশা

থাকত, তাও যুধিষ্ঠির জন্মালেন সবার আগে,—এমন কি, ঐ গোঁয়ার ভীমও কিনা বয়সে দুর্যোধনেব একবেলার বড়! বরাত—বরাত!

ভীমই হয়েছেন দুর্যোধনেব মস্ত জ্বালা। হাজার হাতির শক্তি ভীমেব দেহে। দুর্যোধন তাঁকে এড়িয়েই চলেন। তবু কি বেহাই আছে? এই ত সেদিন। কৌরব-পাণ্ডবেরা একত্রে গিয়েছিলেন বাগানে। এক-একজনে এক-একটি গাছে উঠে ফল খেতে আরম্ভ করলেন। ভীম এক ফাঁকে চুপিসাড়ে নেমে পড়লেন গাছ থেকে, তাবপর এক-একটি গাছে মাবলেন এক-এক লাথি,—ঝম্‌ঝম্‌ করে উঠল গাছগুলো, গম্‌গম্‌ করে উঠল সাবা বাগান, আর দুম্‌দাম্‌ করে মাটিব উপরে আছড়ে পড়লেন এক শ পাঁচ ভাই—যেন এক-একটি বোঁটা-খসা পাকা তাল!

আরেক দিনের কথা। কৌরব-পাণ্ডবেরা মিলে ঝুটোপুটি সাঁতার কাটছিলেন রাজদীঘিতে। হঠাৎ ভীমেব মাথায় চাপল দুষ্টবুদ্ধি। তিনি এক-একবারে চার-পাঁচটি করে ভাইকে চেপে ধরে জলের মধ্যে ডুবোতে লাগলেন। বারংবার চোবানি খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখলেন কুমাবেরা। ভীমের চেহারা যেমন পাহাড়ের মত, গায়েও অসুরের বল। বুনো হাতিকে লেজে ধরে মাথার উপরে তুলে তিনি ঘোরান, দুহাতে দু-দুটো বুনো ষাঁড়কে শিঙে ধরে ঠেলে কাবু করেন, বাঘ-সিংহ ত তাঁর কাছে কুকুর-বিড়ালের সমান।

আর শুধু কি ভীম? ঐ অর্জুন? কৃপাচার্য অস্ত্রবিদ্যা শেখাচ্ছেন কুমারদের। অন্য কুমারেরা এখন পর্যন্ত ভাল করে ধনুকই ধরতে পারেন না, অথচ অর্জুন কিনা এরই মধ্যে প্রায় সমস্ত ধনুর্বিদ্যা শিখে ফেলেছেন। ভীমার্জুন একত্র হলে সারা পৃথিবীই জয় করতে পারেন—কৌরবেরা কোন্‌ ছার! সুতরাং, বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করার ক্ষমতা নেই দুর্যোধনের।

তারপর যুধিষ্ঠিব। প্রজারা সব 'বড় কুমাব' বলতে অজ্ঞান—ভারী ধার্মিক নাকি তিনি! ধার্মিক না ছাই—সব ভণ্ডামি—সব মন ভোলাবাব কৌশলমাত্র।

নাঃ, দুর্যোধন আর পাবেন না! তাঁর আহারে রুচি নেই, রাতে ঘুম নেই, মনে আনন্দ নেই, জীবনে স্বস্তি নেই। অবশেষে তিনি স্থির করলেন: যে করেই হোক, ভীমকে মাবতে হবে। ভীম মরলে, কৌরবেরা সবাই মিলে অর্জুনকেও মারতে পাববেন। তখন যুধিষ্ঠির ত শোকেই মাবা যাবেন—ভাইয়েদেব যা ভালবাসেন তিনি।

ভীমকে মাবার ফন্দি আটেন দুর্যোধন। একদিন তিনি ভাল ভাল সব সন্দেশ তৈরী করালেন। তার মধ্যে কয়েকটাতে তিনি মিশিয়ে দিলেন সাজ্ঘাতিক কালকূট-বিষ। সে বিষ খেলে মানুষ টের পায় না যে বিষ খাচ্ছে, অথচ ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ে মারা যায়।

সন্দেশ তৈবী করিয়ে দুর্যোধন কৌরব-পাণ্ডবদেব বললেন: "চল, ভাই, আজ সবাই মিলে গঙ্গাতীরের বাগানে গিয়ে বনভোজন করি।"

[illegible] উপরে
[illegible] চাট-বড়
[illegible] পাখি।
[illegible] কচঞ্চু
[illegible] অপূর্ব
মায়াপুরীতে নানা রঙের দীপ জ্বেলেছে, আর পাখিরা যেন মন-মাতান সুরে পথিকদের ডাকছে "আয় আয়" বলে।

কুমারেরা গঙ্গাতীরে গিয়ে প্রথমে সবাই বেশ খানিকটা হুটোপুটি সাঁতার কাটলেন, তারপর একত্রে খেতে বসলেন।

আজ দুর্যোধনের কাছে ভীমের খাতির দেখে কে? তিনি নিজে সন্দেশ বেছে বেছে "খাও দাদা—খাও দাদা" বলে খাওয়াতে লাগলেন ভীমকে। আর ভীম? তাঁর ত ভোজনেই আনন্দ! খেতে তিনি বেজায় পটু, তাই লোকে তাঁকে বলত: বৃকোদর অর্থাৎ বাঘের মত পেটওআলা লোক। ভীম মহানন্দে টপাটপ্ কয়েক শ বিষ-মাখান সন্দেশ খেয়ে ফেললেন।

খেয়ে-দেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। সাঁতার কেটে পরিশ্রম হয়েছিল খুব, তারপর খাওয়াটাও হয়েছিল ভারী, ফলে শোওয়ামাত্র সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন অসাড়ে।

ঘুম নেই শুধু দুর্যোধনের চোখে। বাঘের মত ওঁত পেতে বসে আছেন তিনি! যেই সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন, অমনি তিনি নিজের কয়েকটি ভাইকে ঘুম থেকে তুললেন। ভীম তখন বিষের ঘোরে অজ্ঞান। দুর্যোধন এবং তাঁর ভায়েরা বনলতা দিয়ে শক্ত করে বাঁধলেন তাকে, তারপর গঙ্গায় ফেলে দিলেন।

ঘুম ভেঙে ভীমকে দেখতে না পেয়ে পাণ্ডবেরা ভাবলেন: তিনি বোধহয় আগেই ফিরে গেছেন রাজপুরীতে। তাঁরাও তাই রাজপুরীতে ফিরে গেলেন। কিন্তু সেখানেও ভীম নেই!

ব্যাপার শুনে আকাশ ভেঙে পড়ল মা-কুন্তীর মাথায়। তিনি ভাবলেন: ভীমকে মোটেই দেখতে পাবেন না দুর্যোধন,—কে জানে, দুর্যোধনই হয়ত মেরে ফেলেছেন তাঁকে।

বিদুরকে ডেকে পাঠালেন কুন্তী। বিদুর সব শুনে চুপি-চুপি বললেন: ভয় নেই, ভীম ফিরবেনই,

যে পাণ্ডবেরা দীর্ঘজীবী হবেন।

এদিকে জ্ঞানহারা ভীম একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছেন গঙ্গায়। শেষে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন একেবারে নিচে—পাতালে নাগলোকে। সেখানে সব সাপের বাস। ভীমকে দেখতে পেয়ে ফোঁসফোঁস করে তেড়ে এল তারা, এলোপাথারিভাবে ছোবল মারতে লাগল তাঁকে। এতে ভীমের অপকারের বদলে উপকারই হল—সাপের বিষে সন্দেশের বিষ গেল কেটে—বিষে হল বিষক্ষয়! ভীম চেতনা ফিরে পেলেন।

চেতনা ফিরে পেতেই ভীম যে-কে সেই। কি, সাপের এত স্পর্ধা—তাঁকে কামড়ায়! এক মোচড়ে তিনি তাঁর দেহ থেকে লতার বাঁধন পট্ করে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর শুরু হল সাপদের সঙ্গে তাঁর ছেলেখেলা—এক-একটা সাপকে হাতের মুঠোয় টেনে ধরেন তিনি, আর তার মাথাটা গুঁড়িয়ে দেন। এমনি করে অনেক সাপ তিনি মারলেন।

সাপেরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল তাদের রাজা বাসুকির কাছে। ‘মহারাজ, কে একটা মানুষ এসে নাগলোক ধ্বংস করে ফেলল যে! যেমন পাহাড়ের মত চেহারা তার, তেমনি দানবের মত শক্তি।”

বাসুকি সাপদের সঙ্গে এসে ভীমকে দেখেই বলে উঠলেন: “আরে [illegible] আর, [illegible]

[illegible] তিনি [illegible] বাসুকি [illegible] হাজার [illegible] এক-এক চুমুকে এক-একটি করে মোট আট কলসী রসায়ন পান করলেন। তারপর আট দিন ধরে একটানা ঘুমলেন তিনি।

আট দিনের দিন ঘুম ভাঙল ভীমের। আট কলসী রসায়ন পান করে তাঁর দেহে প্রায় অযুত হস্তীর বল হয়েছে। তখন তিনি নাগরাজ বাসুকির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নাগেদের পিঠে চড়ে গঙ্গাতীরে এসে পৌঁছলেন। বাসুকি তাঁকে বহু মূল্যবান্ অলঙ্কার উপহার দিলেন।

ভীমকে ফিবে পেয়ে মা-কুন্তী আর পাণ্ডবদের সে কি আনন্দ! ওদিকে দুর্যোধন যখন দেখলেন যে, ভীম কালকূটও হজম কবলেন, তখন তাঁর দুঃখ আব দুশ্চিন্তার পরিসীমা রইল না।

অস্ত্রপরীক্ষা

দিন কাটে।

এক দিন কৌরব-পাণ্ডবেরা মাঠে গুলিডাণ্ডা খেলছিলেন। হঠাৎ তাঁদেব গুলিটা ছিটকে গিয়ে পড়ল একটা কুয়োর মধ্যে। কুয়োটায় জল ছিল না বটে, কিন্তু সেটা গভীর ছিল খুব। কুমারেরা তাই গুলিটা তুলতে পারলেন না। এদিকে তাঁদের আর গুলিও নেই। ফলে, খেলা গেল পণ্ড হয়ে—কুমারেরা মুখ কাল করে দাঁড়িয়ে বইলেন।

সেখানে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একধারে বসে হোম করছিলেন। কুমারদের অবস্থা দেখে মায়া হল তাঁর। তিনি তাঁদের ডেকে হেসে বললেন: "কি, গুলিটা তুলতে পারলে না তোমরা? তোমরা না ক্ষত্রিয়? তোমরা না ভরতবংশের সন্তান? ছিঃ! এই দেখ, কি করে তুলতে হয়।"

কাছেই ছিল কাশের বন। ব্রাহ্মণ একটা কাশ ছিঁড়ে সেটি ছুড়ে মারলেন কুয়োর মধ্যে। কাশটা গিয়ে গুলিটায় বিঁধে গেল।

তাবপব আবেক কাশ ছুড়লেন তিনি। সেটি গিয়ে বিঁধল প্রথম কাশটিব পিছনে। এমনি কবে কাশেব পব কাশ গাঁথতে লাগলেন তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষেব কাশটি কুয়োব পাড়ে এসে ঠেকল। তাবপব তিনি শেষেব কাশটি ধবে সেই কাশে গাঁথা গুলিটাকে স্বচ্ছন্দে তুলে আনলেন। নিজেব হাতেব আঙ্‌টিটাকেও কুযোব মধ্যে ফেলে দিয়ে অমনি ভাবে সেটাকে তুললেন তিনি।

কুমাববা চমৎকৃত হলেন। কি অদ্ভুত লক্ষ্য—কি অভিনব কৌশল! ব্রাহ্মণকে তাঁবা সমাদব কবে নিয়ে গেলেন ভীষ্মেব কাছে।

ব্রাহ্মণকে আগে থেকেই চিনতেন ভীষ্ম। নাম তাঁব দ্রোণ। ... —সেকালেব সেবা ধনুর্বিদ: কুমাবদের অস্ত্রগুরু আচার্য কৃপেব ভগিনীপতি তিনি। ভীষ্মেব অনুবোধে কুমাবদেব অস্ত্রশিক্ষাব ভাব নিলেন দ্রোণ। কৃপও অবশ্য বইলেন তাঁব সহকাবী হযে।

কযেক বছব ধবে আচার্য দ্রোণেব কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখলেন কুমাববা। তাঁদেব মধ্যে অর্জুন ছিলেন সবচেয়ে মেধাবী, সবচেয়ে মনোযোগী, তাই তিনি আচাযেব সেবা শিষ্য হয়ে উঠলেন। দ্রোণও তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন ...

... ...বত্থুর প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান ...দেব নিয়ে সভা জাঁকিয়ে বসলেন ধৃতরাষ্ট্র। গান্ধারী কুন্তী প্রভৃতি রাজবাড়িব মেয়েরা বসলেন চিকের আড়ালে। পুরোহিত

মঙ্গলাচরণ করলেন, নিশান উড়ল, বাজি পুড়ল, বাদ্য বাজল, নকিব ঘোষণা করল কুমারদের নাম।

আর, কুমাররা দ্রোণ ও কৃপের পিছনে পিছনে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন। তাঁদের পরনে পট্টবস্ত্র, কোমরে বাঁধা রঙীন উত্তরীয়, মাথায় রঙীন উষ্ণীষ, কানে স্বর্ণকুণ্ডল, বাহুতে স্বর্ণবলয়, তাঁদের বুকে লৌহকবচ, হাতে ধনুক ও গদা, পৃষ্ঠে তূণীব, কটিবন্ধে অসি।

আবম্ভ হল অস্ত্রক্রীড়া। কুমারদেব অস্ত্রচালনার কৌশল দেখে সবাই 'ধন্য ধন্য' করতে লাগলেন।

ভীম ও দুর্যোধনেব গদাযুদ্ধ দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল সবাই। মস্ত দুই গদা হাতে নিয়ে দুই খেপা হাতিব মত তাঁরা লড়তে লাগলেন। চিরকালই তাঁদের মধ্যে রেষারেষি, এখন তাঁবা একেবারে মারমুখী হয়ে উঠলেন। তা দেখে দ্রোণ ভয় পেয়ে থামিয়ে দিলেন তাঁদেব।

এবার আরম্ভ হল অর্জুনের তীরধনুকেব খেলা। সে কি কৌশল! প্রথমেই তিনি একটা বাণ ছুড়ে চারদিকে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বালিয়ে তুললেন। লোকে ত ভয়ে অস্থির! এমন সময়ে আবেক বাণ ছুড়লেন তিনি। চারদিক্ অমনি জলে থই থই করতে লাগল—আগুন গেল নিভে। আবাব আবেক বাণ—ব্যস্, অত জল কোথায় মিলিয়ে গেল!

এমনি নানান্ খেলা দেখালেন অর্জুন। সবাই অবাক্ হলেন—এমন কৌশল দেখেননি কেউ কখনও।

এই সময়ে একটি যুবক তীরধনুক হাতে নিয়ে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন। অপূর্ব তাঁর চেহারা—পর্বতের মত উন্নতকায় তিনি, মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রখর দীপ্তি তাঁর দেহে; তাঁর কানের কুণ্ডল ও বুকের কবচ তাঁর শরীরেরই অংশ—ওগুলি নিয়েই তিনি জন্মেছেন!

যুবকটি জানালেন ঃ তাঁর নাম কর্ণ, তিনিও অর্জুনের মত সমস্ত অস্ত্রকৌশল দেখাতে পারেন। গুরু দ্রোণের অনুমতি নিয়ে সত্যিই তিনি অর্জুনের সমস্ত কৌশল দেখালেন, বরং কিছু বেশীই দেখালেন; তারপর দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন অর্জুনকে।

দুর্যোধন ত আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন! এই ত তাঁর মনের মানুষ—অর্জুনের সঙ্গে লড়তে চান! তখনি কর্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব-স্থাপন করলেন তিনি।

দ্রোণ দেখলেন ঃ মহাবিপদ্! মনে হচ্ছে ঃ কর্ণ অর্জুনের চেয়ে অস্ত্রবিদ্যায় ঢের বেশী দক্ষ; তারপর তিনি আবার এখন বন্ধু হলেন পাণ্ডবদ্বেষী দুর্যোধনের; নিশ্চয় তিনি অর্জুনের প্রাণনাশের চেষ্টা করবেন। অথচ, কর্ণ অবধ্য, কারণ তাঁর সহজাত কবচ ও কুণ্ডল আছে। কিন্তু অর্জুনকে যুদ্ধ করতে ত দিতেই হবে,—ক্ষত্রিয়বংশের ছেলে তিনি, দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান পেয়ে এগিয়ে না গেলে লোকে তাঁকে কাপুরুষ বলবে যে!

বিষম সমস্যা! দ্রোণকে এ বিপদের হাত থেকে বাঁচালেন গুরু কৃপ। তিনি কর্ণকে বললেন ঃ "শোন, বাপু কর্ণ, অর্জুন হলেন রাজপুত্র—যার-তার সঙ্গে ত তাকে যুদ্ধ করতে দেওয়া যায় না। আগে তোমার পরিচয় দাও—বুঝে দেখি ঃ তুমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার যোগ্য লোক কিনা।"

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন কর্ণ। তাঁর অতীত জীবনের কাহিনী স্বপ্নের মত তাঁর মনের চোখের উপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। কে যে তাঁর বাপ আর কে যে মা, তা তিনি জানেন না। ছেলেবেলায় তাঁকে কুড়িয়ে পান এক সূত। সেই সূত আর তার স্ত্রীই তাঁকে মানুষ করেন। তাঁদেরই তিনি বহুকাল নিজের বাপ-মা প্রভৃতি রাজতেন। সূতেরা হল বৈশ্যজাতি—রথ-চালান আর পুরাণের

কাহিনী বলা তাদের বৃত্তি। এ পরিচয় দিলে ক্ষত্রিয় রাজপুত্র অর্জুনকে কখনই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেওয়া হবে না। তবে, কর্ণ ছোটখাট একজন রাজা হলেও ছিল ভিন্ন কথা।

কর্ণের এ অসুবিধা দূব করে দিলেন দুর্যোধন। তিনি তখনি ব্রাহ্মণ ডাকিয়ে কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজপদে অভিষিক্ত করালেন। এখন আর অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কোন বাধা রইল না অঙ্গরাজ কর্ণের।

এমন সময়ে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন অধিরথ—কর্ণের পালক-পিতা। কর্ণ তাঁর নতুন মুকুট-পরা মাথা অধিরথের পায়ে লুটিয়ে দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। অধিরথ তাঁর বড় আদরের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন: "একি, বাবা কর্ণ, রাজরাজড়াদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ কেন তুমি? চল, বাবা, ঘরে চল। তোমার মা রাধা যে তোমার কথা ভেবে ভেবে পাগল হতে বসেছেন।"

এতে সবাই কর্ণের পরিচয় পেয়ে গেল। কর্ণ তাহলে সূতপুত্র, রাধার ছেলে তিনি—রাধেয়। পাণ্ডবপক্ষের লোকেরা তাঁকে টিটকারি দিয়ে বলতে লাগল: "আরেরে, সূতপুত্র রাধেয় এসেছেন কিনা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কুরুবংশের কুমারদের সঙ্গে লড়াই করতে!"

এ কথায় দুর্যোধন গেলেন খেপে। দেখতে দেখতে সভার মধ্যে দুটো দল হয়ে গেল—এক দল কর্ণ-দুর্যোধনের পক্ষে, আরেক দল পাণ্ডবদের পক্ষে। তুমুল কাণ্ড বাধে আর কি!

ঠিক এমনি সময়ে সূর্যাস্ত হওয়ায় সেকালের নিয়মমত অস্ত্র-পরীক্ষা বন্ধ হল। কর্ণার্জুনের যুদ্ধ আর সেদিন হল না।

জতুগৃহদাহ

নাঃ, আর পারেন না দুর্যোধন। শেষে কিনা যুধিষ্ঠিরকেই যুবরাজ করলেন ধৃতরাষ্ট্র! তার উপর আবার প্রজারা আজকাল বলতে আরম্ভ করেছে: যুধিষ্ঠিরের মত সর্বগুণে গুণী ধার্মিক যুবরাজ থাকতে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র কেন আর রাজ্যশাসন করবেন? পাণ্ডুপুত্রকেই রাজা করে অন্ধরাজ বিশ্রাম গ্রহণ করুন। এসব শুনে রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে দুর্যোধন বাপের কাছে গেলেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন কর্ণ আর শকুনি। শকুনি হলেন দুর্যোধনের মামা।

ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁরা বোঝালেন যে, যুধিষ্ঠির রাজা হলে ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর ছেলেদের কেউ আর গ্রাহ্য করবে না—ক্রমে ক্রমে তাঁদের মানসম্মান সব লোপ পাবে।

ধৃতরাষ্ট্রও ভাবলেন: ঠিক ত!

তখন সবাই পরামর্শ করে স্থির করলেন: পাণ্ডবদের বারণাবতে অর্থাৎ আজকের বারাণসীতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সেখানে তাঁদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারা হবে।

ধৃতরাষ্ট্র ডাকিয়ে আনালেন যুধিষ্ঠিরকে। বললেন: "বাবা যুধিষ্ঠির, বারণাবত অতি পুণ্যতীর্থ। আমার ভারী ইচ্ছা, তোমরা ক ভাই তোমাদের মাকে নিয়ে তীর্থটি দর্শন করে এস।"

যুধিষ্ঠির বুঝলেন যে, জেঠামশায়ের উদ্দেশ্যটি খুব সাধু নয়—তাঁদের বারণাবতে পাঠানর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কু-অভিপ্রায় আছে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ কি করে অমান্য করা যায়? একেই ত তিনি জ্যেষ্ঠতাত—গুরুজন, তার উপরে আবার রাজা।

অতএব বারণাবতে যাত্রা করলেন পাণ্ডবেরা। যাবার সময়ে খুড়ো বিদুর যুধিষ্ঠিরকে ম্লেচ্ছভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, বারণাবতে

তাঁদের পুড়িয়ে মারার ষড়্‌যন্ত্র করা হয়েছে—তাঁরা যেন তাঁদের বাসগৃহ ভাল করে পরীক্ষা করে নেন। যুধিষ্ঠির ও বিদুর ছাড়া উপস্থিত আর কেউ ম্লেচ্ছভাষা জানতেন না ; তাই তাঁদের দুজনের মধ্যে যে কি কথাবার্তা হল, তা তাঁরা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারলেন না।

এদিকে পুরোচন নামে এক মন্ত্রীকে প্রচুর অর্থ দিয়ে বশ করে বারণাবতে পাঠিয়ে দিলেন দুর্যোধন। পুরোচন পাণ্ডবদের আগেই সেখানে পৌঁছে চমৎকার একটি বাড়ি তৈরী করালেন। বাড়িটি তৈরা হল জতু অর্থাৎ গালা আর শন ধুনা চর্বি প্রভৃতি দিয়ে, যাতে আগুন লাগামাত্র একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বারণাবতে পৌঁছলেন পাণ্ডবেরা। পুরোচন তাঁদের খুব আদর-যত্ন করে ঐ জতুগৃহে নিয়ে তুললেন। বিদুরের উপদেশমত যুধিষ্ঠির পরীক্ষা করে টের পেলেন যে, বাড়িটি কি দিয়ে তৈরী। তখন ভারী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তিনি, কিন্তু পুরোচনকে নিজের মনোভাব জানতে না দিয়ে মা আর ভাইদের নিয়ে ঐ বাড়িতেই সাবধানে বাস করতে লাগলেন।

কদিন পরে বিদুরের কাছ থেকে এক খনক এসে দেখা করল যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে। চুপি-চুপি সে শোবার ঘরের মধ্যে মস্ত এক চোরা সুরঙ্গ খুঁড়ে দিল। দিনের বেলায় পাণ্ডবেরা ঐ সুরঙ্গ ঢেকে রেখে বাড়ির বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান, আর রাত্রিবেলায় সুরঙ্গে ঢুকে ঘুমন ; ঘুমবার সময়ে এক-এক ভাই পালা করে জেগে পাহারা দেন।

এমনি করে বছর ঘুরে গেল। পুরোচন ঠিক করেছেন : আর কদিন পরেই বাড়িতে আগুন লাগাবেন।

এই সময়ে একদিন কুন্তীদেবী কয়েকজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ

করে এনে খাওয়ালেন। সেদিন এক নিষাদী তার পাঁচ ছেলেকে নিয়ে ভিক্ষা চাইতে এল কুন্তীর কাছে। তাদেরও খাওয়ালেন মা-কুন্তী। আর, তারা এমন খাওয়াই খেল যে আর বাড়ি ফিরতে পারল না—রাত্রিতে সেখানেই পড়ে ঘুমিয়ে রইল। মন্ত্রী পুরোচনও সে রাত্রিতে জতুগৃহে ঘুমলেন।

ভীম দেখলেনঃ চমৎকার সুযোগ! তিনি নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন সেই বাড়িতে, তারপর মা-কুন্তীকে কাঁধে তুলে, নকুল-সহদেবকে কোলে নিয়ে, যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের হাত ধরে টানতে টানতে ঝড়েব বেগে সুরঙ্গপথ ধরে ছুটে পালিয়ে চললেন।

এদিকে আগুন লাগতে না লাগতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল গোটা বাড়িটা। সেই ছাই ঘেঁটে লোকে সাতটি মানুষের কঙ্কাল পেল। তারা ভাবলঃ কঙ্কালগুলি হল মা-কুন্তী পঞ্চপাণ্ডব ও পুরোচনের। আসলে সেগুলি হল ঐ নিষাদী ও তার পাঁচ ছেলের—অবশ্য বিশ্বাসঘাতক পুরোচনও পুড়ে মরেছিল।

পাণ্ডবদের পুড়ে মরার সংবাদ পেয়ে খুব খানিকটা মায়াকান্না কাঁদলেন ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর ত আসল ব্যাপার জানতেনই,—তবু তিনিও একটু লোক-দেখান চোখের জল ফেললেন, যাতে কেউ কিছু না সন্দেহ করে।

হিড়িম্ববধ

এদিকে মা আর ভাইদের নিয়ে ছুটতে ছুটতে ভীম গঙ্গাতীরে পৌঁছলেন। সেখানে বিদুরের লোক তাঁদের অপেক্ষায় ছিল। তারই সাহায্যে গঙ্গা পার হলেন পাণ্ডবেরা।

গঙ্গা পেরিয়ে বনের ভিতর দিয়ে মা ও ভাইদের নিয়ে ছুটে চললেন ভীম। এমন সময়ে মা-কুন্তী পিপাসায় ভারী কাতর হয়ে পড়লেন। ভীম তখন সবাইকে এক বটগাছতলায় রেখে জলের খোঁজে গেলেন।

অনেক খুঁজে একটা নদী দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে কোন পাত্র ছিল না, তাই তিনি নিজের গায়ের চাদর ভিজিয়ে নিয়ে এলেন। ভীম বটগাছতলায় ফিরে এসে দেখেন: তাঁর মা ও ভায়েরা সেখানে মাটিতে শুয়ে অঘোরে ঘুমচ্ছেন। এ দেখে দুঃখে বুক ফেটে গেল ভীমের—মহারাজ পাণ্ডুর পাটরানী আর ছেলেরা কিনা ভিখারির মত ধূলি-শয্যায় নিদ্রা যাচ্ছেন! জলভরা জ্বালাভরা চোখে জেগে বসে ভীম তাঁদের পাহারা দিতে লাগলেন।

ঐ বনে বাস করত হিড়িম্ব-রাক্ষস আর তার বোন হিড়িম্বা-রাক্ষসী। দূরে একটা উঁচু গাছের উপরে বসেছিল তারা। পাণ্ডবদের দেখতে পেয়ে হিড়িম্বের জিভ থেকে জল পড়তে লাগল। বোনকে সে বলল: "আজ অনেক দিন পরে ছ-ছটা নাদুসনুদুস মানুষ এসেছে এ বনে। তুই যা, ভাই, শীগ্‌গির ওদের ধরে নিয়ে আয়,—আজ আমরা মনের সাধ মিটিয়ে তাজা তাজা মানুষ আর তাদের গরম গরম রক্ত খাব।"

যেই না বলা, অমনি হিড়িম্বা গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে চলল।

কিন্তু দূর থেকে ভীমকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল হিড়িম্বা। কি বিরাট্ কি সুন্দর চেহারা তাঁর—যেন তুষারে ঢাকা ধবলগিরি নরমূর্তি ধারণ করেছে! হিড়িম্বার ভারি সাধ হল: সে ভীমকে বিয়ে করে।

হিড়িম্বা তখন এক সুন্দরী স্ত্রীলোকের মূর্তি ধরে ভীমের কাছে গিয়ে বলল: "প্রভু, হিড়িম্ব-রাক্ষস এই বনের রাজা। আমি তার বোন। আপনাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য হিড়িম্ব আমাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি তা করতে চাই না। আপনি আমাকে বিয়ে করুন—আমি আপনাদের পিঠে নিয়ে উড়ে পালিয়ে যাব এ বন থেকে।"

ভীম বললেন: "রেখে দে তোর হিড়িম্ব-রাক্ষস। তাকে ডরাই নাকি আমি? এক চড়েই তার জীবন শেষ করে দিতে পারি। ভাগ্ তুই।"

হিড়িম্বা ভীমকে যতই অনুনয়-বিনয় করে, ততই তর্জন-গর্জন করেন ভীম।

ওদিকে বোনের ফিরতে দেরী দেখে অস্থির হয়ে উঠল হিড়িম্ব। গাছ থেকে নেমে সে নিজেই আসতে লাগল পাণ্ডবদের দিকে। এগিয়ে এসে সে হিড়িম্বার হাবভাব দেখে ত রেগে আগুন: "আরে হতভাগী, মানুষ বিয়ে করার সাধ হয়েছে তোর! দাঁড়া, তোর সাধ মেটাচ্ছি—মানুষগুলোকে মারার আগে তোকেই খুন করব আমি।"

রাগে ফুলতে ফুলতে হিড়িম্ব ধেয়ে এসে আক্রমণ করল হিড়িম্বাকে। তা দেখে ভীম ছিনিয়ে নিলেন হিড়িম্বাকে, তারপর সগর্জনে বললেন: "আরেরে, পাষণ্ড রাক্ষস, স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিস! আয়, লড়্ ত দেখি আমার সঙ্গে।"

আরম্ভ হল দুজনে তুমুল মল্লযুদ্ধ। সে কি যুদ্ধ! তাদের নিঃশ্বাসে ঝড় বইতে লাগল, পায়ের ঘসায় ঘাসগুলি সব উপড়ে গেল—মাটি থেকে ধুলো উড়তে লাগল, তাদের দেহের ধাক্কায় বনের গাছগুলি ভেঙে পড়ল, পশুপক্ষী ভয় পেয়ে পালাতে লাগল বন ছেড়ে।

আর, সেই হট্টগোলে জেগে উঠলেন মা-কুন্তী অন্য চার পাণ্ডব। হিড়িম্বা তাঁদের সব কথা খুলে বলল। অর্জুন ভীমকে সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আর সাহায্য! ভীম ততক্ষণ হিড়িম্বকে পা ধরে মাথার উপরে তুলে বোঁ-বোঁ করে ঘোরাতে আরম্ভ করেছেন। ক্রমে দম বন্ধ হয়ে এল রাক্ষসের। ভীম তখন তাকে চিত করে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর চেপে বসলেন, তারপর দুমড়ে চালকুমড়ো বানিয়ে মেরে ফেললেন তাকে।

হিড়িম্বকে বধ করে ভীম এসে প্রণাম করলেন মা-কুন্তী আর যুধিষ্ঠিরকে। তাঁরা আশীর্বাদ করলেন তাঁকে, আর ছোট ভাইয়েরা 'ধন্য ধন্য' করতে লাগলেন।

আবার বনপথ ধরে এগিয়ে চললেন পাণ্ডবেরা। হিড়িম্বাও তাদের পিছনে পিছনে চলল। তা দেখে ভীম ধমকে উঠলেন: "তুই আবার কোথায় চললি আমাদের সঙ্গে? ভাগ তুই, নইলে এক চড়ে সাবাড় করে দেব তোকে।"

হিড়িম্বা তখন কুন্তীদেবীর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। এতে করুণা হল কুন্তীদেবীর। তাঁর আদেশে ভীম বিয়ে করলেন হিড়িম্বাকে। কিছু দিন পরে তাঁদের একটি ছেলে হল। জন্মমাত্রই সে হল মহাবীর পূর্ণবয়স্ক যুবক। তার মাথাটা ছিল ঘটের মত, আর তাতে চুল ছিল না মোটেও, তাই তার নাম হল: ঘটোৎকচ অর্থাৎ কেশহীন ঘট।

হিড়িম্বা এবার পাণ্ডবদের ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে চলল। মা-কুন্তী ঘটোৎকচকে আশীর্বাদ করে বললেন: "মনে রেখো, বাছা, পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ সন্তান তুমি, তাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করো।"

ঘটোৎকচ জানাল যে, ভীম তাকে স্মরণ করলেই সে হাজির হবে। তারপর সে সবাইকে প্রণাম করে মাকে নিয়ে চলে গেল নিজের রাজ্যে।

বক-সংহার

আবার চলতে লাগলেন পাণ্ডবেরা। বন পেরিয়ে একচক্রা-নগরে পৌঁছলেন তাঁরা। সেখানে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে তাঁরা আশ্রয় নিলেন, নিজেদেরও পরিচয় দিলেন ব্রাহ্মণ বলে।

সারাদিন ধরে পাঁচ ভাই ভিক্ষে করেন। ভিক্ষেয় তাঁরা যা পান, তা সমস্ত সন্ধ্যাবেলায় এনে দেন মা-কুন্তীকে। কুন্তী ঐ খাবার সমান ছ'ভাগ করে এক ভাগ দেন ভীমকে এবং অন্য ভাগ আর চার ছেলেকে নিয়ে নিজে খান।

এমনি করে দিন কাটে। দিন কাটে রাজরানী আর রাজ-পুত্রদের পরের আশ্রয়ে ভিক্ষান্ন খেয়ে।

একদিন পাণ্ডবেরা ভিক্ষেয় বেরিয়েছেন, কেবল ভীম যেন কেন ঘরেই রয়ে গেছেন। হঠাৎ একটা চাপা কান্নার আওয়াজ এল মা-কুন্তীর কানে। ব্যাপার কি, জানার জন্য তিনি বাড়ির ভিতরে গেলেন।

ঘরের মধ্যে বসে আলাপ করছেন সেই বাড়ির ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, তাঁদের ছেলে ও মেয়ে। কুন্তী গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "কি হয়েছে?"

ব্রাহ্মণ বললেন: "হায়, মা, এক রাক্ষসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এই নগরের লোকেরা।"

কুন্তী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "কি রকম?"

ব্রাহ্মণ বললেন : "আমাদের এই নগরের ধারে যে বন আছে, সেখানে থাকে বকরাক্ষস। অতি দুর্দান্ত সে। সে-ই আমাদের রক্ষক ও ভক্ষক। তার অত্যাচারে এ নগর জনশূন্য হতে বসেছে।"

"কেন, নগরের রাজা রাক্ষসটাকে দমন করতে পারেন না ?" জিজ্ঞাসা করলেন কুন্তী।

ব্রাহ্মণ বললেন : "আমাদের রাজা অত্যন্ত দুর্বল ও কাপুরুষ। বককে দমন করার শক্তি তাঁর নেই। তাই বক যাতে একেবারে এ নগর ধ্বংস না করে, সেজন্য তার সঙ্গে এক চুক্তি করেছেন।"

"কি চুক্তি ?"

"চুক্তি হয়েছে : বক বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে এই নগর রক্ষা করবে ; আর তার বদলে রাজা বকের খাবার জন্য নিত্য একটা জীবন্ত মানুষ, দুটো মোষ, আর চল্লিশ মণ চালের অন্ন পাঠাবেন। এই খাবার না পেলে বক নগরের মানুষ মেরে উজাড় করে দেবে। রাজা নিয়ম করে দিয়েছেন যে, নগরের গৃহস্থরা পালা করে এক-একদিন বকের খোরাক জোগাবে।"

"বলেন কি ! এমন অপদার্থ রাজা !" মা-কুন্তী বিস্মিত হন।

ব্রাহ্মণ বললেন : "হ্যাঁ, মা, সত্যি। আজ আমার পালা। সংসারে আমরা চারজন—আমি, ব্রাহ্মণী, আমাদের মেয়ে আর এই ছোট ছেলেটি। স্থির করেছি : আমিই যাব বকের কাছে।"

এ কথা শুনে ব্রাহ্মণী বললেন : "তুমি গেলে কে বিয়ে দেবে এ মেয়ের ? কে পালন করবে এই ছেলেকে ? তার চেয়ে বরং আমিই যাব বকের কাছে। তুমি আবার বিয়ে করে এদের পালন করো।"

ব্রাহ্মণীর কথা শেষ হতে না হতে মেয়েটি বলে উঠল : "তাও কি হয় ! ভাইটি যে নিতান্ত শিশু—তুমি গেলে ত ও বাঁচবে না, মা।

বাবা গেলেও চলে না। সুতরাং, আমিই যাব। তাহলে আমার বিয়ের ভাবনাও আর ভাবতে হবে না তোমাদের।”

এমন সময় ব্রাহ্মণের শিশুপুত্রটি আধো-আধো স্বরে বলে উঠল: “দেখ, তোমরা কান্নাকাটি করো না। আমিই যাব রাক্ষসটার কাছে। আমার হাতে এই যে খড়গাছা দেখছ, এর এক বাড়িতে মেরে ফেলব তাকে।” এই বলে সে খড়গাছাটি মাথার উপরে তুলে সোঁ করে ঘোরাল।

শিশুর কথা শুনে এত দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেললেন সবাই। ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কুন্তীর দিকে চেয়ে বললেন: “না, মা, আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না, তাই চারজনে মিলেই যাব বকের কাছে।”

কুন্তী বললেন: “ভয় নেই, ঠাকুর, রাক্ষসের হাতে মরতে হবে না আপনাদের। আমার পাঁচ ছেলে, তাদের মধ্যে একজন রাক্ষসকে খাবার দিতে যাবে।”

কুন্তীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ অবাক্! মানুষ এমনও মহৎ হয়—মা হয়ে পরকে বাঁচাতে নিজের ছেলেকে মরণের মুখে ঠেলে দেয়! কুন্তীকে তিনি বললেন: “ছি ছি, মা, তাও কি হয়! নিজের প্রাণ বাঁচাতে পরের ছেলেকে মরণের মুখে পাঠালে আমার পাপ হবে যে। তাছাড়া, আপনারা আমার অতিথি—দেবতার তুল্য।”

কুন্তী বললেন: “ভাবনা নেই, ঠাকুর, আমার মেজ ছেলে অত্যন্ত শক্তিশালী, সে আগেও রাক্ষস মেরেছে—বককেও নিশ্চয়ই মারতে পারবে সে।”

এইভাবে ব্রাহ্মণকে অনেক বুঝিয়ে রাজী করালেন কুন্তী। তারপর তিনি ভীমকে গিয়ে সব বললেন। মায়ের আদেশ মাথায় তুলে নিয়ে বকের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন ভীম।

সন্ধ্যাবেলায় আর চার ভাই ভিক্ষে করে বাড়ি ফিরে এলেন। মা-কুন্তীর কাছে তাঁবা সব শুনলেন। শুনে যুধিষ্ঠির আকুল হয়ে বললেনঃ "একি করেছ, মা! মহাবল ভীম যে আমাদের মস্ত ভরসা ; তাকে রাক্ষসের মুখে ঠেলে দিচ্ছ! যদি সে মারা পড়ে ?"

কুন্তী বললেনঃ "ভুল বুঝছ, যুধিষ্ঠির। কোন অন্যায় করিনি আমি। উপকারীর প্রত্যুপকার না করা অধর্ম। অসময়ে আশ্রয় দিয়ে এই ব্রাহ্মণ আমাদের কতই না উপকাব করেছেন। এখন তাঁব অসময়ে আমরা যদি কিছু না করি ত পাপ হবে আমাদের। পুণ্যকর্ম করার জন্যই মানুষেব জীবন। তাছাড়া, ভীম আমার মহাবলশালী ; ভয় কবো না, বককে সে নিশ্চয়ই মারতে পারবে, —হিড়িম্বের কথা মনে নেই তোমার ?"

পবদিন প্রভাতে দুটি মোষে-টানা গাড়িতে বকের জন্য বরাদ্দ খাবাব নিয়ে ভীম বনের মধ্যে গেলেন। বনের মধ্যে ঢুকে তিনি গাড়ি থামালেন, তারপর নিজেই বকের খাবার খেতে খেতে "ওরে বক, আয় আয়" বলে হাঁক পাড়তে লাগলেন।

ডাক শুনে বক ছুটে এল। ভীম তাব খাবার খাচ্ছেন দেখে রাগে সে অগ্নিগিরির মত জ্বলে উঠল। "আরে দুষ্ট, আমার খাবার খাচ্ছিস তুই," এই বলে সে তেড়ে এসে ধাঁই-ধাঁই করে চড় মারতে লাগল ভীমের পিঠে। ভীম তা গ্রাহ্য না করে সমানে খেয়ে চললেন। তা দেখে বক ভীমকে মারাব জন্য মস্ত একটা গাছ উপড়ে আনল। ভীম বাঁ-হাত দিয়ে গাছটা কেড়ে নিয়ে ধীরেসুস্থে খাওয়া শেষ কবে আচমন করলেন।

বক ততক্ষণে আরেকটা গাছ উপড়ে এনেছে। ভীমও একটা গাছ উপড়ে নিলেন। আরম্ভ হল দুজনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

বড় বড় গাছ হাতে নিয়ে চলেছে দুজনের লড়াই। এক-

একজনের হাতের গাছ ভাঙে, অমনি সে নতুন আরেকটা গাছ উপড়ে আনে। এমনি করে বনের সব গাছ নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন আরম্ভ হল দুজনে মল্লযুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যে ভীম বককে উপুড় করে ফেললেন, তারপর হাঁটু দিয়ে তার পিঠ চেপে ধরে তাকে দুমড়ে মেরে ফেললেন।

পরদিন বকের মৃতদেহ দেখে অবাক হল নগরবাসীরা। কুন্তীর অনুরোধে ব্রাহ্মণ আসল কথা গোপন রেখে প্রচার করে দিলেন যে, তাঁর দুঃখ দেখে এক মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে বধ করে গেছেন বককে। এ কথা শুনে একচক্রা-নগরের লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আর প্রণাম জানাল সেই অজানা মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর

একচক্রা-নগরের ব্রাহ্মণ-বাড়িতে পরম যত্নে আছেন পাণ্ডবেরা। এই সময়ে একদিন তাঁরা শুনতে পেলেন: পাঞ্চালদেশের রাজা দ্রুপদের মেয়ের স্বয়ংবরের আয়োজন হচ্ছে। শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন তাঁরা।

অনেক দিন পর্যন্ত রাজা দ্রুপদের কোন সন্তান হয়নি। শেষে তিনি সন্তান পাবার আশায় এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞকুণ্ডের মধ্য থেকে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ওঠে। ছেলেটির নাম: ধৃষ্টদ্যুম্ন—মহাবীর সে। আর, মেয়েটির রঙ্ কাল ছিল বলে তার নাম হয়: কৃষ্ণা। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের মেয়ে কৃষ্ণা, তাই তাকে পাঞ্চালী এবং দ্রৌপদীও বলা হত। রাজা দ্রুপদের আরেক নাম ছিল—যজ্ঞসেন, সেজন্য কৃষ্ণার 'যাজ্ঞসেনী'-নামও হয়।

সেকালে ক্ষত্রিয় রাজরাজড়াদের মেয়ে বিয়ে দেওয়ার একটা

বিশেষ প্রথা ছিল। মেয়ে বড় হলে তার অভিভাবক নিমন্ত্রণ পাঠাতেন দেশবিদেশের রাজরাজড়া ও ক্ষত্রিয় বীরপুরুষদের কাছে। তাঁরা নির্দিষ্ট দিনে এসে সভা করে বসতেন। কন্যা তার ধাত্রী ও সখীদের নিয়ে আসত ঐ সভায়। মেয়েটির কাছে নিমন্ত্রিত পাত্রদের গুণাবলী বর্ণনা করা হত। কন্যা তখন তার মনোমত বর বেছে নিত। তার প্রিয় সখীর হাতে সোনার থালার উপরে থাকত মোটা একগাছি ফুলের মালা। সেই মালাগাছি সে পরিয়ে দিত মনোনীত পাত্রের গলায়। তারপব ধুমধাম কবে বিয়ে হয়ে যেত দুজনের। এই প্রথাকে বলা হত ঃ স্বয়ংবব।

রাজা দ্রুপদও কৃষ্ণাব স্বয়ংবরেব আয়োজন কবেছিলেন।

পাঞ্চালের কাল রাজকন্যা কৃষ্ণার রূপে ভুবন আলো। তাই, মা-কুন্তীকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডবও যাত্রা করলেন পাঞ্চাল-নগরে। পথে তাঁদের সঙ্গে দেখা হল ধৌম্যঋষির। তাঁকে পাণ্ডবেরা নিজেদের পুরোহিত করে নিলেন। ধৌম্যও পাণ্ডবদের সঙ্গে পাঞ্চালে চললেন। পাঞ্চালে পৌঁছে তাঁরা অতিথি হলেন এক কুমোরের বাড়িতে।

স্বয়ংবরের বিবাট্ আয়োজন হয়েছে পাঞ্চাল-নগরে। দেশ-বিদেশের রাজরাজড়া ও বীরপুরুষ আর কেউ বাকী নেই—সবাই এসেছেন। তাঁদের যানবাহন সৈন্যসামন্ত ও লোকজনে গম্‌গম্ করছে সারা পাঞ্চাল। তাছাড়া, আরও নানা লোক এসেছে স্বয়ংবর দেখতে—এসেছেন মুনি-ঋষিরা, ব্রাহ্মণ বৈশ্য আব শূদ্রেরা, এসেছে ছেলে-বুড়ো সবাই। পাঞ্চালরাজ সকলেরই থাকার ব্যবস্থা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সারা রাজ্য জুড়ে চলেছে মহোৎসব, শুধু 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রব—'দাও দাও' 'খাও খাও' করছে সবাই!

অবশেষে স্বয়ংবরের দিনটি এল। দ্রুপদের প্রকাণ্ড সভা জুড়ে

বসলেন সব রাজরাজড়া আর বীরপুরুষেরা। খুব ঘটা করে দামী দামী জামাকাপড় আর হীরে-জহরত পরে এসেছেন তাঁরা। অন্য জাতের লোকেরাও গিয়ে সভার এক পাশে বসলেন। আর, পাণ্ডবেরা বসলেন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁদের পুরোহিত ধৌম্যকে নিয়ে।

কনের বেশে দ্রৌপদী এলেন স্বয়ংবর-সভায়। তাঁর প্রধানা সহচরীর হাতে সোনার থালায় বরণমালা। ঐ মালাই ত কৃষ্ণা পরিয়ে দেবেন তাঁর মনোমত পাত্রকে। পাণিপ্রার্থী ক্ষত্রিয়ের দল সব চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

এমন সময়ে দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘোষণা করলেন যে, দ্রুপদরাজার একটি পণ আছে। তিনি একটি যন্ত্র তৈরী করিয়ে খুব উঁচুতে রেখেছেন। ঐ যন্ত্রের উপরে আছে একটি লক্ষ্যবস্তু। দ্রুপদ একটি ধনুকও তৈরী করিয়েছেন। সেই ধনুক থেকে পাঁচটা তীর এমনভাবে ছুড়তে হবে যে, সেগুলি যেন যন্ত্রটির ছিদ্র ভেদ করে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুটিকে বিঁধে মাটিতে ফেলে। এ কাজ যিনি করতে পারবেন, তিনিই হবেন কৃষ্ণার স্বামী।

তারপর দ্রুপদের ধনুকটি সভায় আনা হল। সে ধনুঃ দেখে সবাইয়ের চক্ষুঃস্থির—অত বড় ধনুক তোলাও যে শক্ত ব্যাপার। চেষ্টার তবু ত্রুটি হল না।

দুর্যোধনেরা শত ভাই, তাঁদের মামা গান্ধাররাজ শকুনি, এবং আরও অনেক বীরপুরুষ ধনুকে জ্যা পর্যন্ত পরাতে পারলেন না। তখন উঠলেন কর্ণ। সহজেই তিনি ধনুকে জ্যা পরালেন। সবাই ভাবল : নিশ্চয়ই লক্ষ্যবেধ করতে পারবেন তিনি। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্নের মুখে কর্ণের পরিচয় পেয়ে দ্রৌপদী বললেন যে, তিনি সূতপুত্রকে বিয়ে করবেন না। এ কথা শুনে কর্ণ মৃদু হেসে ধনুর্বাণ ফেলে দিলেন। তাঁর হাসির পিছনে ছিল ক্রোধ উপেক্ষা ও ক্ষোভ !

তখন আর মাত্র তিনজন ক্ষত্রিয় বীর বাকী—চেদিরাজ শিশুপাল, মগধরাজ জরাসন্ধ, এবং নকুল-সহদেবের মামা মদ্ররাজ শল্য। তিনজনেই মহাবীর। তাঁরা অতি কষ্টে ধনুকে জ্যা পরালেন বটে, কিন্তু বাণ ছুড়তে গিয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন।

এমনি ভাবে যখন সমস্ত ক্ষত্রিয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন উঠে দাঁড়ালেন। সহজেই তিনি ধনুক তুললেন, সহজেই তাতে জ্যা পবালেন, তাবপর সহজেই পাঁচ-পাঁচটা তীর ছুড়ে লক্ষ্যটিকে বিঁধে মাটিতে ফেললেন। সভার লোক 'জয় জয়' করে উঠল। আর, সঙ্গে-সঙ্গে দ্রৌপদী এসে ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন অর্জুনের গলায়।

অর্জুন লক্ষ্যবেধ কবলেন দেখে ক্ষত্রিয়েরা গেলেন খেপে: "কি! এত বড় কথা! আমাদের হারিয়ে পাঞ্চালীকে জিনে নেবে ভিখাবি ব্রাহ্মণ!" তাঁবা দল বেঁধে আক্রমণ করলেন অর্জুন ও দ্রুপদকে। অর্জুনও তীরধনুক বাগিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। ভীমেব আবার রাগ বেশী, তিনি একটা প্রকাণ্ড গাছ উপড়ে নিয়ে অর্জুনকে সাহায্য করাব জন্য ছুটে গেলেন। অর্জুনের তীরে বিদ্ধ হয়ে এবং ভীমের গাছের বাড়ি খেয়ে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ল ক্ষত্রিয়েরা।

স্বয়ংবর-সভায় সেকালের দুই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষও এসেছিলেন। তাঁরা হলেন দ্বারকা-রাজ্যের কর্তা শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর বড় ভাই বলদেব। মা-কুন্তী সম্পর্কে এঁদের পিসী হতেন। কোনক্রমে এঁরা জানতে পেরেছিলেন যে, জতুগৃহদাহে পাণ্ডবেরা মারা যাননি। এখন এঁরা ভীমার্জুন ও তিন পাণ্ডবকে চিনতে পারলেন। তখন তাঁরা মধ্যস্থ হয়ে যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন।

দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে কুমোরের বাড়িতে গেলেন পাণ্ডবেরা। মা-কুন্তী তখন অন্তঃপুরে ছিলেন। ভীমার্জুনের সাধ হল : তাঁরা মাকে চমকে দেবেন। তাই তাঁরা দরজা থেকেই ডেকে বললেন : "দেখে যাও, মা, ভিক্ষায় আজ কি চমৎকার বস্তু পেয়েছি।"

কিছু না দেখেই বাড়ির ভিতর থেকে মা-কুন্তী জবাব দিলেন : "তাই নাকি! তা, যা পেয়েছ, পাঁচ ভাইয়ে মিলে ভাগ করে নাও।"

কি সাঙ্ঘাতিক আদেশ! কিন্তু মাতৃভক্ত পাণ্ডবেরাও কিছুতেই মায়ের কথা মিথ্যা হতে দিতে পারেন না, তাই তাঁরা স্থির করলেন : পাঁচ ভাইয়ে মিলেই বিয়ে করবেন পাঞ্চালীকে।

রাজা দ্রুপদের বড় সাধ ছিল যে তিনি মহাধনুর্ধর অর্জুনের সঙ্গে বিয়ে দেবেন কৃষ্ণার। এখন তিনি শুধু অর্জুনকেই নয়, পঞ্চপাণ্ডবকেই জামাতৃরূপে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শুভদিনে শুভলগ্নে মহাধূমধাম করে পাণ্ডবদের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল দ্রৌপদীর। পাণ্ডবদের দুঃখের রাত্রি ভোর হল। তাঁরা মা-কুন্তী আর পুরোহিত ধৌম্যকে নিয়ে রাজা দ্রুপদের অতিথিরূপে বাস করতে লাগলেন পাঞ্চাল-রাজ্যে।

খাণ্ডবদহন

পাণ্ডবেরা বেঁচে আছেন জেনে খুশী হল সবাই—হলেন না কেবল ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন আর দুর্যোধনের বন্ধুরা।

ধৃতরাষ্ট্র লোভী হলেও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি বুঝলেন : পাণ্ডবদের এবার রাজ্য দিতেই হবে, নইলে লোকে ভাববে যে, তিনিই তাঁদের বারণাবতে পাঠিয়ে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত করেছিলেন।

তারা তখন খেপে উঠবে। একেই ত পাণ্ডবেরা সব বড় বড় বীর, তার উপর তাঁদের মামাত ভাই শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ পুরুষ; এখন আবার দ্রুপদের মত শক্তিশালী রাজা হয়েছেন তাঁদের শ্বশুর। সুতরাং, সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত। এই ভাবে সব দিক্ ভেবে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের ডাকিয়ে এনে রাজ্যের অর্ধেক ভাগ দিলেন।

যুধিষ্ঠিরকে বললেন ধৃতরাষ্ট্র: "বৎস যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন আর তার ভাইয়েদের সঙ্গে বনবে না তোমাদের। তোমরা অর্ধরাজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট হও—বাকী অর্ধেক ভোগ করুক দুর্যোধন। খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে তোমরা রাজধানী স্থাপন কর। আশীর্বাদ করি: তোমাদের মঙ্গল হক। দুর্যোধন হস্তিনাপুরেই রাজত্ব করুক।"

জ্যেষ্ঠতাতের অনুরোধ মেনে নিলেন যুধিষ্ঠির। ভাইদের সঙ্গে নিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়ে সেখানে তিনি রাজধানী স্থাপন করলেন। পাণ্ডবদের সুশাসনে প্রজারা মুগ্ধ হল, রাজ্য ধনসম্পদে পূর্ণ হল। খাণ্ডবপ্রস্থকে লোকে বলতে লাগল: ইন্দ্রপ্রস্থ, অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য।

কিছুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণ এলেন খাণ্ডবপ্রস্থে।

তখন গ্রীষ্মকাল। একদিন কৃষ্ণ ও অর্জুন যমুনা-নদীতে স্নান করতে গেলেন। স্নান সেরে নদীতীরে গাছের ছায়ায় বসে তাঁরা নিরালায় আলাপ করছেন, এমন্ সময়ে এক ব্রাহ্মণ এলেন সেখানে। তিনি তাঁদের কাছে কিছু খাদ্য প্রার্থনা করলেন।

তাঁরা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন: "কি খাবেন বলুন?"

ব্রাহ্মণ বললেন: "আমি অগ্নিদেব। সাধারণ খাবারে ত আমি তৃপ্ত হব না।"

"তবে কি খাবার চাই আপনার ?" জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণার্জুন।

অগ্নি বললেন: "যজ্ঞের ঘি খেয়ে খেয়ে আমার অগ্নিমান্দ্য হয়েছে। প্রতিকারের জন্য সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে খাণ্ডববন পুড়িয়ে খেতে উপদেশ দেন। কিন্তু কিছুতেই আমি খাণ্ডবদহন করতে পারছি না।"

"আপনি স্বয়ং অগ্নিদেব হয়েও কেন খাণ্ডবদহন করতে পারছেন না ?" প্রশ্ন করেন কৃষ্ণার্জুন।

অগ্নি বললেন: "দেবরাজ ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষকনাগের পরিজনেরা বাস করেন খাণ্ডববনে। তাই আমি ঐ বন দহন করতে গেলেই ইন্দ্র মুষলধারে বৃষ্টি নামান, ফলে আগুন যায় নিভে। তাই আমি খাণ্ডবদহনও করতে পারছি না, আমার অগ্নিমান্দ্যও সারছে না। তা, তোমরা যদি ইন্দ্রকে ঠেকাতে পার, আর বনের প্রাণীরা যাতে না পালায় তার ব্যবস্থা করতে পার, তাহলে আমি স্বচ্ছন্দে খাণ্ডবদহন করতে পারি।"

অর্জুন জানালেন যে, উপযুক্ত ধনুঃ রথ আর ঘোড়া পেলে তাঁরা অগ্নিদেবের সাধ মেটাতে পারেন।

অগ্নিদেব তখন অর্জুনকে এনে দিলেন বিরাট্ এক ধনুঃ, তার নাম গাণ্ডীব, আর দুটি অক্ষয় তূণীর অর্থাৎ সে দুটি তূণীরের বাণ কখনও ফুরত না; আর এনে দিলেন একখানা রথ, সেখানি হল কপিধ্বজ অর্থাৎ তার ধ্বজায় বসে থাকত একটি বিরাট্‌কায় বানর। গাণ্ডীবের টঙ্কার শুনলে রথধ্বজের বানরটিকে দেখলেই ভয় হত শত্রুদের।

কৃষ্ণকেও দুটি অস্ত্র দিলেন অগ্নিদেব। একটি হল চক্র, নাম তার: সুদর্শন; চক্রটিকে ছুঁড়ে মারলে সেটি শত্রুর মাথা কেটে ফেলে আবার অধিকারীর হাতেই ফিরে আসত। অন্য অস্ত্রটি হল একটি



গদা—যেমনি ভারী তেমনি ভয়ঙ্কর ; সেটির নাম হল ঃ কৌমোদকী।

আরম্ভ হল খাণ্ডবদহন। অগ্নির তেজে সমস্ত বন জ্বলে উঠল দাউদাউ করে। বনের সমস্ত পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রাণ নিয়ে পালানর জন্য ছুটোছুটি করতে লাগল খেপার মত। কিন্তু উপায় আছে নাকি পালানর ? অর্জুনের বাণে আর কৃষ্ণের চক্রের ঘায়ে তারা খণ্ড খণ্ড হয়ে ঘুরে পড়তে লাগল আগুনের মধ্যে।

এ দেখে বন্ধু তক্ষকের পরিজনদের বাঁচানর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন দেবরাজ ইন্দ্র। আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নামালেন তিনি। বৃষ্টির জলে খাণ্ডবের আগুন বুঝি নিভে যায় ! কিন্তু অর্জুনের বাণের দাপটে বৃষ্টি গেল বন্ধ হয়ে। তখন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। কিন্তু কৃষ্ণার্জুন তাঁদের হারিয়ে দিলেন।

এবার অগ্নিদেব মহাসুখে খাণ্ডববন পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন। কেবল ছটি প্রাণী ছাড়া বনের সমস্ত পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ পুড়ে মরল। এ ছটি প্রাণী হল ঃ ময়দানব, তক্ষক নাগের ছেলে অশ্বসেন, এবং চারটি শার্ঙ্গক পাখি। অশ্বসেন ও পাখি চারটি কোনক্রমে পালিয়ে বেঁচেছিল, আর ময়দানব কৃষ্ণার্জুনের পা জড়িয়ে ধরে নিজের প্রাণ-ভিক্ষা চেয়েছিল বলে অর্জুন দয়া করে তাঁকে ছেড়ে দেন।

কৃষ্ণার্জুনের বীরত্বে ভারী প্রীতিলাভ করলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি বর দিলেন ঃ অর্জুন তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে সমস্ত দিব্যাস্ত্র পাবেন এবং কৃষ্ণার্জুনের বন্ধুত্ব চিরদিন অটুট থাকবে।

সভাপর্ব

রাজসূয়-যজ্ঞ

যে-সে লোক ছিল না ময়দানব—সে ছিল মস্ত কারিগর। বিশ্বকর্মা যেমন দেবতাদের কারিগব, ময়ও ছিল তেমনি দানবদের কাবিগব। দেববাজ ইন্দ্রেব অলকাপুরীব চেয়েও চমৎকাব এক রাজসভা সে তৈবী কবেছিল দানবরাজ বৃষপর্বার জন্য।

অর্জুনেব দয়ায় প্রাণে রক্ষা পেয়ে পাণ্ডবদেব প্রতি ভাবী কৃতজ্ঞ হয়েছিল ময়। তাই সে বিন্দু-সরোবর থেকে দানবরাজ বৃষপর্বার বিবাট্ গদাটি এনে উপহাব দিল ভীমকে। তারপর সে যুধিষ্ঠিরের জন্য তৈরী কবে দিল এমন এক সভাগৃহ, যার তুলনা স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে কোথাও ছিল না সেকালে।

ততদিনে যুধিষ্ঠিরেব সুশাসন আব ধার্মিকতার খ্যাতি রটে গিয়েছিল দেশে-বিদেশে। লোকে তাঁব আখ্যা দিয়েছিল ঃ ধর্মরাজ।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সাধ হল যে, তিনি সম্রাট্ হবেন। সেকালে সম্রাট্ হতে হলে রাজসূয় নামে এক যজ্ঞ কবতে হত। বড় সহজ ছিল না এই যজ্ঞ করা। যজ্ঞকারী যদি পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে তাঁর বশে আনতে পারেন, যদি পারেন তাঁদের কাছ থেকে কর আদায় করতে, তাঁরা যদি তাঁকে শ্রেষ্ঠ বাজা বলে মেনে নেন, তবেই না তিনি রাজসূয়-যজ্ঞ করার অধিকারী হবেন—তবেই না সম্রাট্ হতে পারবেন তিনি।

মন্ত্রীরা বন্ধুরা আর ভাইয়েরা যজ্ঞ করতেই পরামর্শ দিলেন যুধিষ্ঠিরকে। কিন্তু কৃষ্ণ বললেন ঃ মগধরাজ জরাসন্ধ হলেন পৃথিবীর

শ্রেষ্ঠ বীর, যুধিষ্ঠিরকে কখনই কর দেবেন না তিনি; সুতরাং, জরাসন্ধ বেঁচে থাকতে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে রাজসূয়-যজ্ঞ করার আশা নিতান্তই দুরাশা।

তখন পরামর্শ করে স্থির করা হল: ভীমার্জুনকে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে মগধে যাবেন শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করতে।

তা, জরাসন্ধকে বধ করা ত কথার কথা নয়। তিনি শুধু বড় বীরই নন—রাজাও তিনি বড়। তাঁর সৈন্যবাহিনী যেমন বিশাল, তেমনি শক্তিশালী। ছিয়াশিজন রাজাকে তিনি বন্দী করে রেখেছেন তাঁর রাজধানী গিরিব্রজে; তাঁর সঙ্কল্প: আর চোদ্দজনকে বন্দী করতে পারলেই, এই মোট এক শ রাজাকে তিনি বলি দেবেন মহাদেবের কাছে।

যাহোক, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভীমার্জুনকে নিয়ে কৃষ্ণ উপস্থিত হলেন গিরিব্রজে। তারপর সোজা জরাসন্ধের কাছে গিয়ে বললেন: "যুদ্ধং দেহি"—যুদ্ধ কর। জরাসন্ধও তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে ভীমের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

তের দিন ধরে সমানে চলল এই মল্লযুদ্ধ। দুজনেই সমান বলবান্, সমান কৌশলী। তের দিন ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করেও কেউ কাউকে কাবু করতে পারলেন না। চোদ্দ দিনের দিন জরাসন্ধ ঈষৎ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ভীম সেই ফাঁকে কৃষ্ণের ইঙ্গিতমত মগধরাজকে মাথার উপরে তুলে এক শ বার ঘোরালেন, তারপর তাঁর দু পা ধরে টেনে দু-আধখানা করে ফেললেন তাঁকে।

জরাসন্ধ-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ গিরিব্রজের কারাগার থেকে মুক্ত করে দিলেন বন্দী রাজাদের। রাজারা স্বপ্নেও ভাবেননি যে, তাঁরা কোনদিন জরাসন্ধের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। তাই তাঁরা মহানন্দে যুধিষ্ঠিরকে কর দিতে রাজী হলেন। কৃষ্ণ তখন জরাসন্ধের

ছেলে সহদেবকে মগধের সিংহাসনে বসালেন, তারপর ভীমার্জুনকে নিয়ে ফিরে গেলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।

এরপর আরম্ভ হল পৃথিবীর সমস্ত রাজার কাছ থেকে কর আদায়ের পালা। রাজারা ত আর এমনিতে কর দেবেন না—তাঁদের যুদ্ধে হারিয়ে তা আদায় করতে হবে। তাই সৈন্যসামন্ত সাজিয়ে অর্জুন গেলেন উত্তর দিকের রাজাদের জয় করতে, ভীম গেলেন পুব দিকে, দক্ষিণে গেলেন সহদেব আর পশ্চিমে নকুল। দুর্ধর্ষ চার ভাইয়ের কাছে হার মানলেন চার দিকের রাজারা। সমস্ত রাজাকে হারিয়ে, তাঁদের কাছ থেকে কর আদায় করে, নানা ধনরত্ন নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন চার ভাই।

এবার মহাসমারোহে যজ্ঞের আয়োজন হল। পৃথিবীর সমস্ত রাজা নিমন্ত্রণ পেয়ে এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। হস্তিনাপুর থেকে এলেন ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ, শতভাই দুর্যোধন, প্রভৃতি। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল ইন্দ্রপ্রস্থ—তিলধারণের স্থান রইল না কোথাও।

নানা দেশের রাজারা নানা উপহার এনেছেন সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের জন্য। কি সব বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার আর কতই না সে সবের দাম!

মুনি-ঋষি আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা এসেছেন দলে দলে। শাস্ত্র-পুঁথি খুলে যজ্ঞের বিধিনিয়ম নিয়ে তুমুল তর্কাতর্কি করছেন তাঁরা।

সমস্ত অতিথির পরিচর্যা বসবাস ও খাওয়া-দাওয়ার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেছেন পাণ্ডবেরা। চারদিকে সমুদ্রগর্জনের ন্যায় অবিরাম কলকোলাহল শোনা যাচ্ছে। সবাই বলছেঃ এমন বিরাট্ আয়োজন আর নাকি কখনও দেখা যায়নি।

যজ্ঞ আরম্ভ হল। প্রথমেই প্রথামত গুরু, পুরোহিত, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ, ছাত্র, রাজা ও বন্ধুদের প্রত্যেককে একটি করে অর্ঘ্য দেওয়া

হল। এবার উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠজনকে অর্ঘ্য দিতে হবে। কে পাবে এই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য? এত সব মুনি-ঋষি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রাজরাজড়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

ভীষ্ম বললেন: শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ।

পরম প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ পিতামহের অভিমত শুনে কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যটি দিলেন।

এতে চেদির রাজা শিশুপাল চটে গেলেন। তিনি ছিলেন জরাসন্ধের সেনাপতি। একেই তিনি কৃষ্ণের চিরশত্রু, তার উপর জরাসন্ধ-বধের ফলে তিনি আরও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এখন কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পেতে দেখে বাঘের মত গর্জন করে পাণ্ডবদের ও কৃষ্ণের নিন্দা করতে লাগলেন তিনি।

কৃষ্ণনিন্দা শুনে ভীষ্ম রুষ্ট হলেন। তিনি বললেন যে, শিশুপালের মরণ ঘনিয়েছে। এই বলে শিশুপালের সম্বন্ধে তিনি একটি কাহিনী বললেন। অদ্ভুত সে কাহিনী।

তিনটি চোখ আর চারখানি হাত নিয়ে জন্মান শিশুপাল। তখন দৈববাণী হয়: যার কোলে উঠলে এই শিশুর তৃতীয় চক্ষুটি মিলিয়ে যাবে এবং বাড়তি হাতদুটি খসে পড়বে, তারই হাতে মরণ হবে এঁর—অন্য কেউ মারতে পারবে না। এরপর কতজনের কোলেই না তুলে দেওয়া হল শিশুপালকে, কিন্তু তাঁর তৃতীয় নয়নটিও মিলায় না, বাড়তি হাতদুখানিও খসে না।

সভার সমস্ত লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিলেন ভীষ্মের মুখে শিশুপালের জন্মকাহিনী। ভীষ্ম বলতে লাগলেন: শেষে একদিন কৃষ্ণ এসে কোলে নিলেন শিশুপালকে। অমনি তার তৃতীয় চক্ষুটি লোপ পেল, বাড়তি হাতদুখানিও পড়ল খসে। শিশুপালের মা ছিলেন কৃষ্ণের পিসী। ব্যাপার দেখে বিষম শঙ্কিত হলেন তিনি।

কৃষ্ণের হাতদুটি ধরে তিনি মিনতি করলেন: "শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করো, বাবা।" পিসীমার সে অনুরোধ রাখতে সম্মত হলেন কৃষ্ণ।

ভীষ্মের কথা শুনে শিশুপালেব ক্রোধ আবও বেড়ে গেল। তিনি আস্ফালন করে কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান কবলেন।

এতটা দম্ভ অসহ্য হল শ্রীকৃষ্ণের। তিনি উঠে দাঁড়ালেন; তারপব সভার লোকদের সম্বোধন করে বললেন যে, শিশুপাল চিরকালই তাঁর শত্রুতা করে আসছেন; শিশুপালেব শত অপবাধ ক্ষমা কববেন বলে তিনি পিসীমাকে কথা দিয়েছিলেন সত্য, তা শত অপরাধ অনেক দিন আগেই পূর্ণ হয়ে গেছে—আজ আর তিনি কিছুতেই ক্ষমা করবেন না শিশুপালকে।

এই বলে শিশুপালকে লক্ষ্য করে সুদর্শন-চক্র ছুড়লেন কৃষ্ণ। চক্রটি বিদ্যুৎগতিতে ঘুবতে ঘুবতে ছুটে গিয়ে চক্ষেব নিমেষে শিশু-পালের মাথা কেটে ফেলল, তারপব আবাব কৃষ্ণের হাতেই ফিবে এল। ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সভার লোক।

এর পর রাজসূয়-যজ্ঞ নির্বিঘ্নেই নিষ্পন্ন হল। কিন্তু জের তার এখানেই মিটল না।

দ্যূতক্রীড়া

রাজসূয়-যজ্ঞেব পর ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে হস্তিনাপুরে ফিরে চলেছেন সদলবলে রাজা দুর্যোধন। মুখখানি তাঁর বড় ম্লান। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে তাঁর মাথা ঘুরে গেছে। তাছাড়া, ময়দানবের তৈরী পাণ্ডবদের সভাগৃহ—সে এক আশ্চর্য সৃষ্টি! তার মধ্যে চলাফেরা করতে গিয়ে পদে-পদে অপদস্থ হয়েছেন দুর্যোধন।

সভাগৃহ ত নয়—মায়াপুরী যেন! একবার চলতে চলতে হঠাৎ দুর্যোধন দেখতে পেলেন: বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে গভীর জল। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গুটিয়ে নিয়ে তিনি পার হতে গেলেন সে স্থানটি। অমনি অট্টহাস্য করে উঠল সভার লোক। আসলে, সে স্থানটিতে জল ছিল না মোটেই—ময়দানব মণিমাণিক্য দিয়ে এমন কৌশলে তৈরী করেছিল জায়গাটিকে যে দেখলেই যেন গভীর জলমগ্ন বলে মনে হয়!

আরেক বার। একটা প্রকৃত জলমগ্ন জায়গা দেখে দুর্যোধন ভাবলেন: এটিও বুঝি ময়দানবের ফাঁকিবাজি। এবার তাই কাপড় না গুটিয়েই পেরতে গেলেন জায়গাটি। আর, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝুপ্ করে পড়লেন জলের মধ্যে। সহদেব তাড়াতাড়ি শুকনো কাপড়-চোপড় এনে দিলেন দুর্যোধনকে। কিন্তু লোকের হাসি আর থামে না,—এমন কি, পাণ্ডবদের কিঙ্করেরা পর্যন্ত চাপা হাসিতে ফেটে পড়বার উপক্রম করল।

তারপর, কখনও বা দেওয়ালকে দরজা ভেবে মাথা ঠুকে মরেছেন দুর্যোধন, কখনও বা দরজাকে দেওয়াল ভেবে বেরবার পথ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছেন!

এমনি ভাবে অপদস্থ হওয়ার গ্লানি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না দুর্যোধন। ঈর্ষ্যার বিষে তাঁর সমস্ত অন্তর জ্বলছে। হস্তিনাপুরের পথে যেতে যেতে হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠলেন তিনি: "না না, পারব না—কিছুতেই পারব না পাণ্ডবদের এ ঐশ্বর্য সইতে। তার চেয়ে উপবাসে প্রাণত্যাগ করব আমি।"

সঙ্গীরা অবাক্ হলেন—ভয় পেলেন। মামা শকুনি পরামর্শ দিলেন ভাগনেকে: পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য দেখে দুঃখে প্রাণত্যাগ করা বোকামি হবে, তাতে পৃথিবীর লোক হাসবে; তার চেয়ে বরং বাজি

রেখে পাশা খেলার জন্য যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করে আনা হোক হস্তিনাপুরে ; পাশা খেলতে বড় ভালবাসেন যুধিষ্ঠির, সুতরাং তিনি এ আমন্ত্রণ পেলে আসবেনই ; তখন তাঁকে পাশায় হারিয়ে শকুনি তাঁর সমস্ত সম্পদ্, এমন কি রাজ্য পর্যন্ত, জিতে নিয়ে দিতে পারবেন দুর্যোধনকে।

মামার পরামর্শ মনে ধরল দুর্যোধনের, কারণ শকুনি ছিলেন সেকালের সেরা পাশা-খেলোয়াড়।

হস্তিনাপুরে পৌঁছেই সবান্ধবে দুর্যোধন গেলেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। ধৃতরাষ্ট্র ত প্রথমে কিছুতেই মত দেবেন না পাশাখেলায়—বললেন ঃ পাশা সর্বনাশা—মহা অনর্থের মূল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক বলে-কয়ে তাঁকে রাজী করালেন দুর্যোধন।

তখন ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদীকে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন।

আরম্ভ হল পাশাখেলা। এক দিকে যুধিষ্ঠির, আরেক দিকে দুর্যোধনের হয়ে শকুনি।

যুধিষ্ঠিরের প্রথম পণ হল ঃ তাঁর বহুমূল্য কণ্ঠহার ; আর দুর্যোধন পণ রাখলেন দামী দামী রত্নমণি। প্রথমে পাশার দান ফেললেন যুধিষ্ঠির ; তারপর শকুনি দান ফেলে বললেন ঃ "জিতলাম।" আর, সত্যিই জিতলেন তিনি ! যুধিষ্ঠির তাঁর কণ্ঠহার খোয়ালেন।

পরের বারও অমনি করে জিতলেন শকুনি, তার পরের বারও। এমনি ভাবে বারংবার হারতে লাগলেন যুধিষ্ঠির এবং একে একে তাঁর সম্পদ্ খোয়াতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাঁর ধনরত্ন গেল, যানবাহন গেল, পশুপক্ষী দাসদাসী গেল, গেল রাজ্যও।

যুধিষ্ঠির এবার পণ রাখবেন কি ? পণ রাখলেন তাঁর ভাইদের।

তাঁদেরও হারালেন তিনি। যুধিষ্ঠিরের সর্বনাশা পাশার নেশার ফলে তাঁব ভাইয়েবা হলেন কৌরবদের দাসে পরিণত।

এর পর নিজেকে পণ রাখলেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু এবারও শকুনির জয়। যুধিষ্ঠির নিজেও কৌরবদের কিঙ্কর হলেন।

যুধিষ্ঠিরের শেষ পণ দ্রৌপদী। তাঁকেও হাবাতে বিলম্ব হল না ধর্মরাজেব।

এই ভাবে সব হারিয়ে সভার মধ্যে মাথা হেঁট করে বসলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। কৌববদের এখন উল্লাস দেখে কে? শকুনির কূট পাশায় পলকে ব্যর্থ হয়ে গেল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ আর সম্রাট্‌-পদ!

দুষ্টবুদ্ধি চাড়া দিয়ে উঠল দুর্যোধনেব মাথায়। কুৎসিত কৌতুকে তিনি আদেশ দিলেন: দ্রৌপদীকে এখনি নিয়ে আসা হোক কুরুসভায়, কারণ তিনি এখন কৌরবদের কিঙ্করী।

এই আদেশ শুনে দুর্যোধনের মেজ ভাই দুঃশাসনের মহাস্ফূর্তি—তিনি গিয়ে চুলে ধরে টানতে টানতে দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে এলেন। তারপর তাঁকে সে কি অকথ্য অপমান! দুর্যোধন দুঃশাসন কর্ণ ও শকুনি মিলে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করলেন দ্রৌপদীকে। দ্রৌপদী হাতজোড় করে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধদের প্রত্যেকের কাছে মিনতি জানালেন তাঁকে রক্ষা করাব জন্য। কিন্তু, হা অদৃষ্ট, কেউই বড় একটা কথা বললেন না! আর, বলেই বা কি হবে—দুর্যোধন কি কোন সদুপদেশে কান দেবার পাত্র?

ভীমসেন এতক্ষণ রাগে ফুলছিলেন, কিন্তু বড় ভাই যুধিষ্ঠিরের মুখ চেয়ে সব সয়ে যাচ্ছিলেন। এবার দ্রৌপদীর অপমানে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হল। মনে পড়ল তাঁর কৃষ্ণার স্বয়ংবরের কথা: দেশ-

বিদেশের রাজারা যখন সবাই একত্র হয়ে আক্রমণ করেছিলেন দ্রুপদ ও অর্জুনকে, তখন মহাবীর ভীমই ত পরাস্ত করেছিলেন সেই সব রাজাদের—পশুরাজ সিংহের প্রতাপে শিবাদল যেমন দিগ্বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে পালায়, তেমনি করেই সেদিন পালিয়েছিলেন রাজারা ভীমের পরাক্রম দেখে।

সেই কৃষ্ণা-দ্রৌপদীর এত অপমান! তাও আবার ভীমের সামনে! সক্রোধে দাঁড়িয়ে উঠলেন ভীম, আরক্তনয়নে সভামধ্যে ঘোষণা করলেনঃ এ পাপের শাস্তি তিনি অবশ্যই দেবেন দুর্যোধনকে—সম্মুখযুদ্ধে গদার আঘাতে তাঁর উরুভঙ্গ করবেন।

অমানুষিক শক্তিধর ভীমের প্রতিজ্ঞা! এ প্রতিজ্ঞার লঙ্ঘন নেই, ব্যত্যয় নেই,—মৃত্যুর মত অমোঘ নির্মম এ প্রতিজ্ঞা। সভাজন সব ভয়ে কেঁপে উঠলেন—কেঁপে উঠলেন ধৃতরাষ্ট্র। এতক্ষণে তাঁর যেন শুভবুদ্ধির উদয় হল। তিনি দ্রৌপদীকে নানা সান্ত্বনা দিলেন, অনেক তিরস্কার করলেন দুর্যোধনকে, তারপর পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। পাণ্ডবেরা জ্যেষ্ঠতাতকে প্রণাম করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে চললেন।

কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না তাঁরা। তাঁরা হস্তিনাপুর ছেড়ে যেতে না যেতেই দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝালেন যে, দ্রৌপদীর অপমানে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন পাণ্ডবেরা—তাঁরা নিশ্চয়ই কৌরবদের ধ্বংস করার চেষ্টা করবেন; সুতরাং, এখনি তাঁদের দমন করতে হবে।

কিন্তু উপায় কি পাণ্ডবদের দমন করবার?

উপায় আবার পাশাখেলা। এবার পণ থাকবেঃ যে পক্ষ হারবেন, তাঁদের বনবাসে যেতে হবে বার বছরের জন্য, তারপর এক বছর হবে থাকতে অজ্ঞাতবাসে; এবং ঐ অজ্ঞাতবাসের সময়ে যদি

তাঁদের কেউ চিনে ফেলে, তবে আবার বার বছর বনবাসে ও এক বছর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে।

দুর্যোধনের সঙ্গে একমত হলেন ধৃতরাষ্ট্র। সুতরাং, মাঝপথ থেকে আবার ফিরিয়ে আনা হল পাণ্ডবদের।

আবার বসল পাশাখেলা। আবার কূটকৌশলী দান ফেললেন শকুনি। আবারও হারলেন ধর্মরাজ সম্রাট্ যুধিষ্ঠির।

এবারের পণ-অনুসারে দ্রৌপদীকে নিয়ে বনবাসে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন পাণ্ডুপুত্রেরা। রাজবেশ খুলে ফেলে গাছের বাকল পরলেন তাঁরা, খুলে ফেললেন সব আভরণ, নতমুখে প্রস্তুত হলেন বনযাত্রার জন্য।

দিগ্বিজয়ী পাণ্ডবদের দুর্দশা দেখে দুঃশাসনের উল্লাস আর ধরে না! ভীমকে উপহাস করে নাচতে লাগলেন তিনি।

এবার আর শুধু ভীম নন, যুধিষ্ঠির-বাদে অন্য চার পাণ্ডবই ধৈর্য হারালেন। ক্রুদ্ধ ভীম প্রতিজ্ঞা করলেন: তিনি সম্মুখযুদ্ধে গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ ত করবেনই, তাছাড়া, দুঃশাসনেরও বুক চিরে রক্তপান করবেন। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন: বার বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসের পর কর্ণকে যুদ্ধে বধ করবেন তিনি। সহদেব বললেন: তিনি প্রাণ নেবেন শকুনির। আর, নকুল ঘোষণা করলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের তিনি যমালয়ে পাঠাবেন।

উপস্থিত জনমণ্ডলী শিউরে উঠল। তের বছর পরে যে প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা উঠবে, তার মেঘগর্জন শোনা গেল আজ!

এর পর পুরোহিত ধৌম্য ও দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডবেরা বনে চললেন। তাঁদের দুঃখে সারা রাজ্য আকুল হল—মানুষ কাঁদল, পশু কাঁদল, পাখি কাঁদল, কাঁদল গাছপালা আর পাহাড়-পর্বতও! কাঁদলেন না কেবল শতভাই দুর্যোধন আর তাঁদের বন্ধুবান্ধব!

বনপর্ব

কাম্যকবনে পাণ্ডব

পায়ে পায়ে বনেব পথে এগিয়ে চলেন পাণ্ডবেবা। প্রজাবাও তাঁদেব সঙ্গে চলে। ধর্মবাজ যুধিষ্ঠিব তাঁদেব অনেক বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিলেন; তাবা কাঁদতে কাঁদতে নিবানন্দ মনে ফিবে গেল হস্তিনায়।

কজন ব্রাহ্মণ কিন্তু কিছুতেই সঙ্গ ছাড়লেন না পাণ্ডবদের। সাবাদিন ধরে তাঁবা পাণ্ডবদেব সঙ্গে পথ চললেন, সন্ধ্যাবেলায় হোম ও বেদপাঠ করলেন, তাবপর সাবারাত ধরে বিশ্রাম করতে করতে নানা আশ্বাস নানা উপদেশ দিলেন যুধিষ্ঠিবকে।

পবদিন ভোরে যুধিষ্ঠিরের চিন্তা হল: এতগুলি ব্রাহ্মণকে কি খেতে দেবেন তিনি? চিন্তা দূব করলেন ধৌম্য পুবোহিত। তিনি সূর্যের তপস্যা করার পরামর্শ দিলেন যুধিষ্ঠিরকে—সূর্যদেব প্রসন্ন হলে খাদ্যের অভাব আব থাকবে না।

ধৌম্যের উপদেশমত শুদ্ধ শান্ত হয়ে সূর্যের উপাসনা করছেন যুধিষ্ঠির: "হে ভানু, তুমি জগতেব চক্ষু, সকল দেহধারী জীবের আত্মা, সকল জীবের জনক তুমি, সকল কর্মীর কর্ম; তোমার পথে আবরণ নেই, অর্গল নেই; তুমি রোগ নাশ কর এবং জীবকুলকে অন্ন প্রদান কর। হে অন্নপতি, আমি তোমাব শরণ নিলাম,—তুমি আমাকে অন্ন দান কব।"

যুধিষ্ঠিরের স্তবে প্রসন্ন হলেন দিবাকর। জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতিময় মূর্তিতে তিনি আবির্ভূত হলেন যুধিষ্ঠিরের সামনে।

ধর্মরাজকে একখানি তাম্রপাত্র দিয়ে তিনি বললেন : দ্রৌপদী যেন নিত্য রন্ধন করেন এই পাত্রে ; তাহলে দ্রৌপদী যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে না আহার করবেন, ততক্ষণ ঐ পাত্রের খাদ্য ফুরবে না, তা অন্ন যতই কম হোক আর অতিথি যতই বেশী হোক না কেন ! সূর্যদেব আরও বর দিলেন যুধিষ্ঠিরকে : ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হলে অবশ্যই রাজ্য ফিরে পাবেন তিনি।

এই ভাবে ভাস্করের কাছ থেকে তাম্রপাত্র পেয়ে অন্নসমস্যা দূর হল বনবাসী পাণ্ডবদের। তাঁরা মনের আনন্দে অতিথি ও ব্রাহ্মণদের সৎকার করতে লাগলেন।

ক্রমে তিন দিন তিন রাত্রি ধরে চলে পাণ্ডবেরা এসে উপস্থিত হলেন কাম্যকবনে। তখন রাত হয়েছে। হঠাৎ একটা ভীষণদর্শন রাক্ষস এসে তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়াল। তার হাতে মস্ত এক জ্বলন্ত মশাল। রাক্ষসটার চোখের রঙ্ তপ্ত তামার মত, দাঁতগুলি যেন সব লৌহদণ্ড, চুলগুলি খাড়া খাড়া। তার গর্জনে বনের সব পশুপক্ষী ভয় পেয়ে চারদিকে ছুটে পালাল, আর দ্রৌপদী ত মূর্ছা যাবার উপক্রম !

যুধিষ্ঠির শান্তভাবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে পথ ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন রাক্ষসকে।

পাণ্ডবদের পরিচয় পেয়ে রাক্ষস একেবারে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠল, হুঙ্কার ছেড়ে বলল : "আমার নাম কির্মীর, আমি এই বনের রাজা। ঐ ভীম আমার পরম বন্ধু হিড়িম্বকে মেরেছে, মেরেছে আমার ভাই বকরাক্ষসকে ; আজ তার প্রতিশোধ নেব আমি—আজ ভীমকে মেরে ওর রক্তে তর্পণ করব আমার ভাইয়ের ও বন্ধুর, তারপর ওর মাংস খাব।"

"তবে রে !" একটা বড় গাছ উপড়ে নিয়ে কির্মীরকে তেড়ে

গেলেন ভীম। কির্মীব তাব হাতের জ্বলন্ত মশালটা ভীমকে ছুড়ে মাবল। ভীম সেটাকে তাঁর বাঁ পায়ের লাথি দিয়ে রাক্ষসের দিকেই আবার ছুড়ে দিলেন। কির্মীবও তখন একটা গাছ উপড়ে নিল। তারপব আবস্ত হল দুজনের লড়াই।

গাছেব পর গাছ উপড়ে নিয়ে লড়তে লাগল দুজনে। হাতেব গাছ ভাঙলেই আবার নতুন গাছ উপড়ে নেন তাঁবা। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাম্যকবনে বড় গাছ আব খাড়া রইল না,—বড় ঝড় হয়ে গেলে যেমনটা হয়, ঠিক্ তেমনিভাবে অত বড় বনটা ওপড়ান গাছপালায় ছেয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ভীম কির্মীরকে শুইয়ে ফেলে তার উপবে চেপে বসলেন এবং হাত-পা দুমড়ে তালগোল পাকিয়ে মেরে ফেললেন তাকে।

এর পর প্রায় এক বছব পাণ্ডবেবা কাম্যকবনে সুখে কাটালেন। তাবপর তাঁরা গেলেন দ্বৈতবনে; সেখানে সবস্বতী-নদীর তীবে আশ্রম তৈবী করে বাস কবতে লাগলেন।

কিরাতার্জুন

পাণ্ডবেবা বেশ বুঝেছিলেন: বিনা যুদ্ধে তাঁদের রাজ্য কখনই ফিরিয়ে দেবেন না দুর্যোধন। যুদ্ধে জিততে হলে উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র আবশ্যক। তাই ইন্দ্রের তপস্যা করবাব জন্য ভাইদের ছেড়ে চলে গেলেন অর্জুন, কারণ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে পারলে সমস্ত দিব্যাস্ত্র পাওয়া যাবে।

ভারতবর্ষের উত্তরে চললেন অর্জুন। ক্রমে হিমালয় ও

গন্ধমাদন পর্বত পার হয়ে তিনি উপস্থিত হলেন ইন্দ্রকীল পর্বতে। সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র তপস্বীর ছদ্মবেশে তাঁকে দেখা দিয়ে উপদেশ দিলেন মহাদেবের তপস্যা করতে—মহাদেবকে সন্তুষ্ট করতে পারলে অর্জুন সমস্ত দিব্যাস্ত্র পাবেন।

অর্জুন তখন এক ঘোর বনের মধ্যে গিয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। সে কি তপস্যা—রাত নেই, দিন নেই,—চোখে ঘুম নেই, মুখে নেই অন্ন,—কেবল তপস্যা আর তপস্যা! নিত্য সূর্য ওঠে আর ডোবে, আকাশে চাঁদ দেখা দেয় আর লুকয়, দিনের পর রাত হয়—রাতের পর দিন, তবু বিরাম নেই অর্জুনের তপস্যার।

এমনি যখন অর্জুনের তপস্যা চলেছে, তখন হঠাৎ একদিন প্রকাণ্ড একটা নীল মেঘবর্ণ বরাহ ভীম গর্জনে তাড়া করে এল অর্জুনকে। অর্জুনের তপস্যা ভেঙে গেল। তিনি বরাহকে মারার জন্য ধনুর্বাণ হাতে নিলেন।

এমন সময়ে এক কিরাত এল সেই বনে। কিরাতেরা অসভ্য বন্য জাতি—বনের পশুপক্ষী মেরে তাদের মাংস খেয়ে জীবনধারণ করত তারা। কিন্তু এ কিরাতটির চেহারা ভারী সুন্দর, ভারী মহিমময়। প্রকাণ্ড তাঁর দেহ, কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ,—বিশাল এক স্বর্ণতরু যেন সে! হাতে এক ত্রিশূল নিয়ে, সঙ্গে তার স্ত্রীকে নিয়ে, সে এসেছে। তার স্ত্রীকেও দেখতে ঠিক দেবীর মত।

অর্জুন যেমনি বরাহকে লক্ষ্য করে বাণ ছুড়লেন, কিরাতও তেমনি বাণ ছুড়ল। একই সময়ে বাণ দুটি গিয়ে বিঁধল বরাহের দেহে। তখন অর্জুনের সঙ্গে বিষম তর্ক বেধে গেল কিরাতের। অর্জুন বললেন: বরাহকে লক্ষ্য করে তিনিই প্রথম শরসন্ধান

করেছিলেন, সুতরাং কিরাতের বাণ ছোড়া উচিত হয়নি, কারণ তাতে মৃগয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। কিরাত এ কথা মানতে ত চাইলই না, উপরন্তু অন্তর-জ্বালান উপহাস করতে লাগল অর্জুনকে।

অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। কিবাতকে লক্ষ্য করে তিনি বাণ ছুড়তে লাগলেন। কিরাত পাহাড়ের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে বাণেব আঘাত সইতে লাগল। দেখতে দেখতে সমস্ত বাণ ফুরিয়ে গেল অর্জুনেব। তবু, কিরাতের না হল কোন ক্ষতি, না সে টলল একটুখানি!

অর্জুন অবাক্! তিনি তখন কিরাতেব গলায় ধনুকের ফাঁস পবিয়ে তার মাথায় মাবলেন প্রচণ্ড এক ঘুষি। কিরাত হাসতে হাসতে অর্জুনেব ধনুক কেড়ে নিল। অর্জুনের তখন সম্বল মাত্র তাঁর খড়্গখানা। তাই দিয়ে তিনি প্রচণ্ড আঘাত কবলেন কিরাতের মাথায়। সে আঘাতে পর্বত বিদীর্ণ হয়, মহীরুহ হয় দ্বিখণ্ড। কিন্তু কিবাতেব কোন ক্ষতি হল না তাতে—তাব মাথায় ঠেকে খড়্গখানা ঠিকবে ফিরে গেল!

এবাব আরম্ভ হল কিরাতার্জুনে মুষ্টিযুদ্ধ। কিছুক্ষণেব মধ্যেই অর্জুনকে জাপটে ধরে বিষম চাপ দিতে লাগল কিরাত। অর্জুন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে অর্জুন স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলেন: একি, তাঁর মত জগদ্বিখ্যাত বীরও কিনা সামান্য এক কিরাতের কাছে হেরে গেলেন! অমন যে তাঁর অক্ষয় তূণীব, তাও পর্যন্ত শূন্য হয়ে গেল, তবু কিছুমাত্র ক্ষতি হল না কিরাতের! অথচ, কিরাত ত সত্যিকারের লড়াই করেনি—অর্জুনের অস্ত্রগুলিকেই কেবল ঠেকিয়েছে সে।

অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন অর্জুন। তবে কি ব্যর্থ হয়ে যাবে তাঁর তপস্যা? প্রসন্ন করতে পারবেন না তিনি মহাদেবকে? তবে কি দিব্যাস্ত্রের অধিকারী হতে পারবেন না তিনি? তাহলে কি করে আর পাণ্ডবেরা পরাস্ত করবেন কৌরবদের? কি করে তাঁরা ফিরে পাবেন পিতৃরাজ্য? তাহলে চিরজীবনই ত বনবাসে কাটাতে হবে তাঁদের। এই কি ধার্মিকতার ফল!

অনেক ভেবে মাটি দিয়ে মহাদেবেব এক মূর্তি গড়লেন অর্জুন। তারপব সেই মৃন্ময় মূর্তির গলায় একগাছি ফুলের মালা পবিয়ে দিয়ে চোখ বুজে একমনে পূজো কবতে লাগলেন। পূজো শেষ করে চোখ মেললেন তিনি। একি আশ্চর্য! যে ফুলমালা তিনি পরিয়েছিলেন মহাদেবের মূর্তির গলায়, তা যে কিরাতের কণ্ঠে দুলছে! তবে কি—?

হাঁ, নিশ্চয়ই স্বয়ং মহাদেব এসেছেন এই কিরাতের ছদ্মবেশে। সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন অর্জুন দেবাদিদেবের পায়ে, স্তব করতে লাগলেন: "হে শিব, হে শম্ভু, হে শঙ্কর, অবোধ আমি—চিনতে না পেরে অপমান করেছি তোমাকে,—তুমি আমাকে ক্ষমা কর, প্রসন্ন হও, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর আমার।"

আশুতোষ মহাদেব প্রসন্ন হলেন। তাঁর নিজের হাতের অমোঘ অস্ত্র 'পাশুপত' দান করলেন অর্জুনকে।

সস্ত্রীক মহাদেব অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অর্জুনের কাছে এলেন দেবরাজ ইন্দ্র, জলদেবতা বরুণ, ধনদেবতা কুবের এবং মৃত্যু-দেবতা যম। তাঁরাও নিজের নিজের অস্ত্রগুলি তাঁকে দান করলেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের বরপুত্র হলেন অর্জুন। ইন্দ্র সাদরে মহা-সমারোহে অর্জুনকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন।

কিছু কাল ধরে নিবাতকবচ নামে এক দুর্ধর্ষ দৈত্য ভারী উপদ্রব করছিল স্বর্গে। ইন্দ্রের আদেশে ঘোরতর যুদ্ধ করে তাকে অর্জুন বধ করলেন। তারপর তিনি ইন্দ্রের পরম যত্নে পাঁচ বছর স্বর্গে বাস করলেন। এই সময়টা তিনি শুধু বিলাসে আরামেই কাটালেন না—গন্ধর্ব চিত্রসেনেব কাছে শিক্ষা পেয়ে নৃত্য-গীত-বাদ্যে পারদর্শী হলেন।

গন্ধর্বহস্তে দুর্যোধনের নিগ্রহ

দুষ্ট কখনও শিষ্টভাবে থাকতে পাবে না—খল বলীয়ান্ হলেই কাবণে-অকারণে পবপীড়নের চেষ্টা করে।

দুর্যোধনেরও সেই দশা! পাণ্ডবদের এত অনিষ্ট করেছেন তিনি—তাঁদের রাজ্য নিয়েছেন, সম্পদ্ নিয়েছেন, বনবাসে পাঠিয়েছেন তাঁদের, তবু মন ভবেনি তাঁর,—আরও আরও উৎপীড়ন কবতে চান তাঁদেব!

পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়েও চুপ করে বসে নেই দুর্যোধন—গুপ্তচরের দ্বারা তাঁদের খবরাখবর নিত্য সংগ্রহ কবছেন। তিনি শুনেছেন যে, সূর্যোপাসনা করে তাম্রস্থালী লাভ করেছেন যুধিষ্ঠির; শুনেছেন যে, কির্মীরকে মেরেছেন ভীম। বনবাসী পাণ্ডবদের কীর্তিকাহিনী শুনছেন দুর্যোধন। শুনছেন আর ঈর্ষ্যার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরছেন।

সম্প্রতি আবার নতুন সব সংবাদ এনেছে গুপ্তচর।

প্রথম সংবাদটি হল ভীমকীর্তি ভীমের সম্বন্ধে। একদিন উত্তর-বাতাস বইছে। সেই বাতাসে উড়ে চমৎকার একটি পদ্মফুল এসে পড়ে দ্রৌপদীর সামনে। কি সুন্দর ফুলটি! সূর্যের আলোর

মত সোনালী তার রঙ, হাজারটি তার পাপড়ি। মুগ্ধ হলেন দ্রৌপদী, ভীমকে অনুরোধ করলেন ঐ রকম আরও কয়েকটি সহস্রদল কনকপদ্ম এনে দিতে।

অস্ত্র হাতে নিয়ে কনকপদ্মের সন্ধানে বেরলেন ভীমসেন। বহু দূর চলার পর তিনি একটি সরোবর দেখতে পেলেন। সরোবরটি যেমনি বিশাল, তেমনি মনোরম; আর তারই জলে ফুটে আছে অজস্র কনকপদ্ম।

সরোবরটি হল ধনদেবতা কুবেরের। তাঁর অনুমতি ছাড়া সে সরোবরে নামার অধিকার নেই কারও। বহু সশস্ত্র রাক্ষস সরোবরটি পাহারা দিচ্ছিল। তারা সব কুবেরের অনুচর। মহাবল ভীম তাদের গ্রাহ্য না করে জলে নামলেন। রক্ষী রাক্ষসেরা ছুটে এল, কুবেরের অনুমতি নিয়ে আসতে বলল ভীমকে।

কিন্তু ভীম কি তাঁর কোন কাজের জন্য কারও অনুমতি চাওয়ার পাত্র? 'ক্ষত্রিয় রাজবংশের ছেলে আমি," সদর্পে বললেন তিনি: "কারও কাছে কিছু ভিক্ষা করা আমার ধর্মে নিষেধ।"

এ কথা শুনে রাক্ষসেরা আক্রমণ করল তাঁকে। কিন্তু ভীমের গদাঘাতে অল্প সময়ের মধ্যেই তারা প্রাণ হারাল; সামান্য কয়েকজন কোনমতে পালিয়ে গিয়ে সংবাদ দিল কুবেরকে। কুবের বললেন: ভীমকে বাধা দেবার প্রয়োজন নেই। ভীম তখন ইচ্ছামত কনকপদ্ম তুলে এনে দিলেন দ্রৌপদীকে। দ্রৌপদী ত মহা খুশী!

দ্বিতীয় সংবাদটিও ভীমের সম্পর্কে। জটাসুর নামে এক রাক্ষস কিছুকাল ধরে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পাণ্ডবদের সঙ্গে বাস করছিল। একদিন ভীম গেছেন মৃগয়ায়, সেই ফাঁকে সে যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব ও দ্রৌপদীকে পিঠে তুলে নিয়ে ছুটে পালাতে লাগল। সহদেব চিৎকার করে ভীমকে ডাকতে লাগলেন।

সহদেবের ডাক শুনে ঝড়ের বেগে ভীম এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। জটাসুরের কাণ্ড দেখে রাগে জ্বলে উঠলেন তিনি, হেঁকে বললেন ঃ "মাছ যেমন ভুল করে খাবার ভেবে বঁড়শির টোপ গেলে, তুইও তেমনি পাণ্ডবদের হরণ করতে গিয়ে মরণ-টোপ গিলেছিস। আজই তোর আয়ুঃশেষ!"

এই বলে জটাসুরকে আক্রমণ করলেন ভীম এবং সহজেই বধ করলেন তাকে।

তৃতীয় সংবাদটি পেয়ে একেবারে ধৈর্যহারা হয়ে পড়লেন দুর্যোধন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন নাকি সমস্ত দিব্যাস্ত্র লাভ করে স্বর্গ থেকে ফিরে এসেছেন ভাইদের কাছে। তবে ত পাণ্ডবেরা অজেয় হয়ে উঠল!

যে যেমন লোক, তার সঙ্গীও জোটে তেমনি। দুর্যোধনেরও ছিল দুই কু-মন্ত্রী—কর্ণ আর শকুনি। তাঁরা পরামর্শ দিলেন ঃ দুর্যোধন যদি জাঁকজমক করে সদলবলে দ্বৈতবনে যান, তাহলে রাজ্যহারা সম্পদ্‌হারা পাণ্ডবেরা নিশ্চয়ই মর্মপীড়ায় কাতর হবেন।

পরামর্শটা ভারী মনে ধরল দুর্যোধনের। তা, দুষ্টের পরামর্শ দুষ্টের ত ভাল লাগবেই। তিনি বন্ধুবান্ধব সৈন্যসামন্ত লোকজন নিয়ে মহাসমারোহে যাত্রা করলেন দ্বৈতবনে।

দ্বৈতবনে একটি মনোরম সরোবর ছিল। ঐ সরোবরে তখন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন তাঁর পরিজনদের নিয়ে স্নান করতে এসেছিলেন। দুর্যোধন তাঁর সৈন্যদের আদেশ দিলেন ঃ "যাও, এখনি গিয়ে গন্ধর্বদের তাড়িয়ে দাও।"

আদেশ পেয়ে সৈন্যেরা সরোবরের দিকে ছুটল, কিন্তু গন্ধর্বদের তাড়িয়ে দিতে গিয়ে নিজেরাই তাড়া খেয়ে পালিয়ে ফিরে এল।

তখন কর্ণ ও অন্যান্য মহাবীরদের সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং দুর্যোধন

চললেন গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। কিন্তু গন্ধর্বদের মারের চোটে কুরুসৈন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগল। তা দেখে কর্ণ প্রাণপণে যুদ্ধ আবস্ত কবলেন। তাঁর বিক্রমে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল গন্ধর্ব-সৈন্য —শত শত গন্ধর্ব মারা পড়ল।

কর্ণের এ বিক্রমের সংবাদ পেয়ে স্বয়ং চিত্রসেন রণক্ষেত্রে এসে মায়াযুদ্ধ আরম্ভ কবলেন। কর্ণ মানুষ—মায়াযুদ্ধ তাঁর জানা ছিল না; তাই বহু চেষ্টা কবেও শেষ পর্যন্ত পবাস্ত হয়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে বণক্ষেত্র ত্যাগ কবলেন। তখন শতভাই দুর্যোধন ও তাঁদেব পত্নীদের বন্দী কবে নিয়ে চললেন চিত্রসেন।

ব্যাপাব দেখে কুরুসৈনিকবা ছুটে গিয়ে সংবাদ দিল পাণ্ডবদেব। ভীম ত সব শুনে ভাবী খুশী—"বেশ হয়েছে! উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে দুষ্টেরা" বললেন তিনি।

কিন্তু যুধিষ্ঠির ভীমকে তিরস্কাব করে বললেন: "ছিঃ ভীম, এ ত আনন্দেব ব্যাপাব নয়। কৌববদের সঙ্গে যতই বিবাদ থাক না আমাদের, বাইরের শত্রু এলে একত্রেই যুদ্ধ কবব আমরা; কারণ বাইরের শত্রুর কাছে কৌরবই হারুক আর পাণ্ডবই হারুক, তাতে সমস্ত ভরতবংশের অপমান। যাও, তোমরা চার ভাই মিলে গন্ধর্বদেব হাত থেকে উদ্ধার করে আন কৌববদের।"

তখন ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গন্ধর্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। গন্ধর্বদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ হল তাঁদের। অর্জুনের বাণে গন্ধর্বেরা অস্থির হয়ে পড়ল, চিত্রসেন হার মানলেন।

স্বর্গে থাকার সময়ে অর্জুন এই চিত্রসেনেরই কাছে নৃত্য-গীত-বাদ্য শিখেছিলেন। চিত্রসেন বললেন: "অর্জুন, এই পাপিষ্ঠ কৌরবেরা তোমাদের উপর নানা অত্যাচার করেছে। তুমি আমার সখা।

৫

তাই ভেবেছিলাম ঃ এদের আমি উপযুক্ত শাস্তি দেব। তা, তুমি যখন বলছ, তখন এদের ছেড়ে দিচ্ছি।"

কৌরবদের মুক্ত করে দিয়ে গন্ধর্বরাজ বিদায় নিলেন। আর, কুরুরাজ দুর্যোধন পাণ্ডবদের উপহাস করতে গিয়ে নিজেই উপহসিত হয়ে ফিরে চললেন হস্তিনায়। এর পর পাণ্ডবেরা দ্বৈতবন ছেড়ে আবার কাম্যকবনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

দুর্বাসার পারণ ও জয়দ্রথের কুকীর্তি

সেকালে এক বিষম রাগী মুনি ছিলেন। নাম তাঁর দুর্বাসা। একটুতেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে ভীষণ ভাষণ অভিশাপ দিতেন তিনি। তিনি কারও গৃহে অতিথি হলে, গৃহস্থ তটস্থ হয়ে পড়ত, ভাবত ঃ তার সর্বনাশ উপস্থিত হয়েছে।

এ হেন দুর্বাসা একদিন দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দুর্যোধনের অতিথি হলেন। দুর্যোধন একমনে সশিষ্য দুর্বাসার সেবা করলেন।

তা, সে মুনির সেবা করা কি সহজ? কোনদিন হয়ত তিনি বলেন ঃ এখনি খাবার চাই, এই বলে শিষ্যদের নিয়ে স্নান করতে গেলেন; দুর্যোধন তাড়াতাড়ি অন্ন রন্ধন করালেন; কিন্তু মুনির আর দেখা নেই!

কোনদিন হয়ত তিনি বলেন ঃ "আজ আর খিদে নেই—খাব না।" দুর্যোধন নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু দুর্বাসা হঠাৎ এসে হাঁক পাড়েন ঃ "কই, খাবার দাও শিগ্‌গির—খিদেয় পেট জ্বলে গেল যে!"

কোনদিন বা মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে খাবার চেয়ে বসেন দুর্বাসা, কিন্তু খাবার তৈরী হলে খান না।

এমনি নানান্ অত্যাচার করেন মুনি। দুর্যোধন সবই নীরবে হাসিমুখে সহ্য করলেন। অবশেষে মুনি প্রসন্ন হলেন, দুর্যোধনকে বর দিতে চাইলেন।

কর্ণ ও শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে দুর্যোধন বললেন: একদিন দ্রৌপদীর আহার শেষ হলে সশিষ্য দুর্বাসা যেন পাণ্ডবদের অতিথি হন।

দুর্যোধন ভেবেছিলেন: দ্রৌপদীর আহারের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যদত্ত তাম্রস্থালীর খাদ্য সেদিনের মত ফুরিয়ে যাবে; সুতরাং তখন যদি দুর্বাসা তাঁর দশ হাজার শিষ্য নিয়ে পাণ্ডবদের অতিথি হন, তাহলে বনবাসী পাণ্ডবেরা কিছুতেই অতিথি-সৎকারে সমর্থ হবেন না; ফলে, দুর্বাসা শাপ দিয়ে তাঁদের সর্বনাশ করবেন।

দুর্যোধনের অনুরোধের উত্তরে দুর্বাসা বললেন: 'তথাস্তু'—তাই হোক।

অপরাহ্নবেলা। দ্রৌপদীর আহার শেষ হয়েছে। সূর্যদত্ত তাম্রস্থালী একেবারে শূন্য। এমন সময়ে দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দুর্বাসা এসে অতিথি হলেন পাণ্ডবদের।

বিষম সঙ্কটে পড়লেন পাণ্ডবেরা। এই অসময়ে কি খেতে দেবেন এতগুলি লোককে তাঁরা? অথচ, আহার না পেলে ক্রোধনস্বভাব দুর্বাসা না জানি কি অভিশাপই তাঁদের দেন! যাহোক, মনের দুশ্চিন্তা মনেই চেপে রেখে দুর্বাসাকে স্নান করে আসতে বললেন যুধিষ্ঠির। সশিষ্য দুর্বাসা স্নান করতে গেলেন।

এদিকে দ্রৌপদী তখন সকাতরে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকছেন: "হে কৃষ্ণ, হে বিপদ্ভঞ্জন, তুমি ত মানুষ নও—ভগবানের অবতার তুমি, ধার্মিকদের রক্ষা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছ পৃথিবীতে; আমরা ত কোনদিন সজ্ঞানে ধর্মলঙ্ঘন করিনি; আমি তোমার শরণ

নিলাম ; হে প্রভু, হে বন্ধু, হে শরণাগতরক্ষক, এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর আমাদের।”

ভক্তের আকুল আহ্বানে আসন টলল ভগবানের। কৃষ্ণ এসে উপস্থিত হলেন পাণ্ডবদের কাছে। তিনি সোজা দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে বললেন : “বড় খিদে পেয়েছে আমার—কিছু খাওয়াও দেখি, কৃষ্ণা।”

দ্রৌপদী ম্লানমুখে বললেন : “হা কৃষ্ণ, সেজন্যই ত এতক্ষণ ডাকছিলাম তোমাকে। আজ আমার খাওয়া হয়ে গেছে—ভগবান্ সূর্যের দেওয়া তাম্রপাত্র এখন খালি। এদিকে এইমাত্র দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দুর্বাসা এসে অতিথি হয়েছেন। স্নান করতে গেছেন তাঁরা। স্নান করে এসে খাদ্য না পেলে না জানি কি অভিশাপই দেন মুনি—যা রাগী তিনি!”

কৃষ্ণ বললেন : “আঃ, রাখ তোমার দুর্বাসার কথা। আমি খিদেয় মরছি,—দেখ, হেঁসেলে কিছু আছে কিনা?”

দ্রৌপদীর আশ্চয লাগে। সঙ্কটকালে এ কি রসিকতা কৃষ্ণের! তবু তিনি হেঁসেল থেকে সূর্যদত্ত তাম্রপাত্রখানি নিয়ে এলেন, কৃষ্ণকে সেখানা দেখিয়ে বললেন : “এই দেখ, কৃষ্ণ, কিছু নেই এতে।”

“দেখি দেখি” বলে দ্রৌপদীর হাত থেকে পাত্রটি নিলেন কৃষ্ণ। সেখানা পরীক্ষা করে দেখে তিনি বললেন : “এই ত একটু শাক আছে।” ঐ শাকটুকু খেয়ে তিনি বললেন : “বিশ্বের ক্ষুধা তৃপ্ত হোক!” এবার তিনি পাণ্ডবদের বললেন দুর্বাসাকে ডেকে আনতে।

এদিকে দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্যেরা নদীতে স্নান করছিলেন। সত্যই ক্ষুধার্ত ছিলেন তাঁরা। হঠাৎ তাঁদের গলা থেকে ঘন ঘন উদ্গার উঠতে লাগল, মনে হল : তাঁরা যেন এইমাত্র খেয়ে উঠলেন—

আর খাওয়ার শক্তি নেই তাঁদের। এখন তাঁরা যুধিষ্ঠিরের দেওয়া খাদ্য খাবেন কি করে? আবার, না খেলেও যে তাঁরা অপরাধী হবেন—পাপ হবে তাঁদের। ফলে, দুর্বাসা ভয় পেয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে আর দেখাই করলেন না—নদীতীর থেকেই শিষ্যদের নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

পাণ্ডবেরা নদীতীরে এসে দেখেন: কোথায় বা দুর্বাসা, আর কোথায় বা তাঁর শিষ্যদল!

* * *

এই ঘটনার কিছু দিন পরে। একদিন পঞ্চপাণ্ডব মৃগয়ায় গেছেন। এমন সময়ে সিন্ধুসৌবীরের রাজা জয়দ্রথ এলেন সেই বনে। সঙ্গে তাঁর অনেক সৈন্যসামন্ত, অনেক অধীন রাজরাজড়া। জয়দ্রথ ছিলেন দুর্যোধনের ভগিনীপতি---দুঃশলাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি।

পাণ্ডবেরা আশ্রমে নেই দেখে দ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে পালাতে লাগলেন জয়দ্রথ। ধৌম্য পুরোহিত অনেক বোঝালেন জয়দ্রথকে। কিন্তু 'চোরা নাহি শুনে ধর্মের কাহিনী!' ধৌম্য আর কি করেন, তিনি চিৎকার করে ভীমকে ডাকতে ডাকতে জয়দ্রথের রথের পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলেন।

এদিকে মৃগয়া করে আশ্রমে ফিরে পাণ্ডবেরা দেখেন: দ্রৌপদী নেই, তাঁর ধাত্রীকন্যা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। ধাত্রীকন্যার মুখে সব ঘটনা শুনে পাণ্ডবেরা তৎক্ষণাৎ রথে চড়ে বেগে জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

পথিমধ্যে জয়দ্রথকে ধরে ফেললেন পাণ্ডবেরা। তাঁদের আক্রমণে জয়দ্রথের সঙ্গী রাজারা ও সৈন্যসামন্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

জয়দ্রথ তখন প্রাণভয়ে দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে নিজের রথে তুলে নিলেন। ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন: "আপনারা সব দ্রৌপদীকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে যান। আমি জয়দ্রথকে দেখাচ্ছি। আজ সে পাতালে গিয়ে পালালেও, আমার হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে পারবে না।"

যুধিষ্ঠির ব্যস্ত হয়ে বললেন: "না-না, ভীম, জয়দ্রথকে প্রাণে মেরো না,—তাহলে ভগিনী দুঃশলা বিধবা হবেন, জননী গান্ধারী অত্যন্ত মর্মব্যথা পাবেন।"

যাহোক, জয়দ্রথের পিছনে রথ ছোটালেন ভীমার্জুন। অর্জুনের বাণে জয়দ্রথের রথের ঘোড়াগুলি সব মারা পড়ল। জয়দ্রথ তখন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে প্রাণপণে ছুটতে লাগলেন। ভীমও রথ থেকে নামলেন। ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে তিনি জয়দ্রথের চুলের মুঠি ধরে তাঁকে মাটিতে ঠাসতে লাগলেন। জয়দ্রথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অর্জুন ভীমকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে প্রাণে মারতে নিষেধ করেছেন।

ভীম তখন জয়দ্রথের মাথার পাঁচ জায়গা মুড়িয়ে দিলেন। সেকালে রাজরাজড়াদের ভৃত্যেরা নিজেদের মাথার পাঁচ জায়গা মুড়িয়ে পাঁচটা ঝুঁটি বাঁধত। জয়দ্রথের মাথা মুড়িয়ে ভীম তাঁকে বললেন: "যদি তোর প্রাণে বাঁচার ইচ্ছা থাকে ত প্রতিজ্ঞা কর্ যে, আজ থেকে সব জায়গায় বলে বেড়াবি: পাণ্ডবদের কিঙ্কর তুই।"

প্রাণের দায়ে ঐ প্রতিজ্ঞাই করলেন জয়দ্রথ। ভীম তখন তাঁকে বেঁধে নিয়ে চললেন যুধিষ্ঠিরের কাছে।

অশেষ করুণা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের—জয়দ্রথকে ছেড়ে দিলেন

তিনি। জয়দ্রথ তাঁকে প্রণাম করে নতমস্তকে বিষণ্নমুখে বিদায় নিলেন।

নিজের রাজ্যে কিন্তু ফিরে গেলেন না জয়দ্রথ। তিনি গঙ্গাতীরে গিয়ে মহাদেবের তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে মহাদেব তাঁকে বর দিলেন যে, তিনি কেবল একদিনের জন্য অর্জুন বাদে অন্য চার পাণ্ডবকে সসৈন্যে পরাস্ত করতে পারবেন।

কর্ণের কবচ-কুণ্ডল হরণ

এই সময়ে পাণ্ডবদের একটি পরমোপকার করেন দেবরাজ ইন্দ্র।

কর্ণের ছিল সহজাত কবচ-কুণ্ডল অর্থাৎ ঐ দুটি তাঁর জন্ম থেকেই দেহসংলগ্ন ছিল—তাঁর দেহেরই অংশস্বরূপ ছিল ঐ দুটি। সহজাত কবচ-কুণ্ডল যার থাকে, তাকে কেউ বধ করতে পাবে না; তাই কর্ণও ছিলেন অবধ্য। সুতরাং, তাঁর মত দুর্ধর্ষ শত্রু পাণ্ডবদের আব কেউ ছিলেন না।

দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন অর্জুনের ধর্মপিতা—তাঁরই বরে জন্ম হয়েছিল অর্জুনের। স্নেহাস্পদ বরপুত্রের মঙ্গল চিন্তা করে কর্ণের কবচ-কুণ্ডল হরণ করার সঙ্কল্প করলেন দেবরাজ।

কর্ণের দানশীলতার তুলনা ছিল না। প্রার্থীকে কখনও বিমুখ করতেন না তিনি। ইন্দ্র তাই স্থির করলেন: ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তিনি কর্ণের কাছ থেকে তাঁর কবচ-কুণ্ডল চেয়ে নেবেন।

দেবরাজের এ অভিসন্ধি টের পেলেন সূর্যদেব। সূর্য ছিলেন কর্ণের ধর্মপিতা। কর্ণকে তিনি স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে ইন্দ্রের কূট অভিসন্ধির কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি কর্ণকে সতর্ক করে

দিলেন: তিনি যেন কাউকে তাঁর কবচ-কুণ্ডল না দেন, কারণ তাহলে প্রাণসংশয় হবে তাঁর।

সূর্যের কথা শুনে সবিনয়ে বললেন কর্ণ: "ক্ষমা করবেন, পিতা, আপনার এ উপদেশ মানতে পারব না কারণ তাহলে ধর্মহানি হবে আমার। দান আমার ব্রত—প্রার্থীকে কখনই বিমুখ করতে পারব না আমি। কবচ-কুণ্ডল ত দূরের কথা—দেবরাজ বা অন্য কেউ এসে যদি আমার প্রাণও চান, তাও হাসিমুখেই দেব।"

কর্ণের মহত্ত্ব ও সাহস দেখে মুগ্ধ হলেন সূর্যদেব, বরপুত্রকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

পরদিন মধ্যাহ্নবেলা। স্নানের পর সূর্যস্তব করছেন দানব্রত কর্ণ। প্রার্থীরা ভিড় করে অপেক্ষা করছে: কখন তাঁর স্তব শেষ হবে—কখন তিনি দান আরম্ভ করবেন।

অবশেষে স্তব সমাপ্ত হল কর্ণের। কল্পতরুর মত তিনি প্রার্থীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে আরম্ভ করলেন। এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। কর্ণ তাঁকে বললেন: "বলুন, ঠাকুর, কি চাই আপনার?"

ব্রাহ্মণ বললেন: "হে দানবীর কর্ণ, তোমার সহজাত কবচ-কুণ্ডল আমাকে দান কর।"

কর্ণ হাসলেন, বললেন: "হে ইন্দ্র, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ সত্ত্বেও আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। হে স্বার্থপর দেবরাজ, আপনি এসেছেন আপনার বরপুত্র অর্জুনের জীবন বাঁচানর জন্য আমার জীবনরক্ষক কবচ-কুণ্ডল হরণ করতে। তাই হোক, দেবরাজ, নিজের জীবন-সংশয় করেও আমার সহজাত কবচ-কুণ্ডল আপনাকে

দেব। কিন্তু, আপনারও কি উচিত নয় বিনিময়ে আমাকে কিছু দেওয়া ?"

কর্ণের মহত্ত্বে বিস্মিত হলেন দেবরাজ,—জেনেশুনে কে পারে এমন ভাবে নিজের জীবনকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে ? এমন মহৎ ব্যক্তিব সর্বনাশ করতে এসেছেন ভেবে লজ্জিত হলেন ইন্দ্র। কর্ণকে তিনি বললেন : "হে মহৎ, আমার বজ্র ছাড়া তোমার যা ইচ্ছা চেয়ে নাও।"

কর্ণ বললেন : "আমাকে এমন অস্ত্র দিন, যা ছুড়ে সমস্ত শত্রুকে বধ কবতে পাবব আমি।"

ইন্দ্র বললেন : "অমন অস্ত্র ত দিতে পারি না, কর্ণ। তবে এই অস্ত্রটি দিচ্ছি তোমাকে। এ অস্ত্র তুমি যাকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ কববে, অবশ্যই মাবা পড়বে সে। কিন্তু ঐ একজন মাত্র শত্রুকে বধ করেই অস্ত্রটি আবাব আমাব কাছে ফিবে আসবে। এই নাও, একাঘ্নী অস্ত্র।"

কর্ণ তাঁব চিবপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনকে বধ কবাব জন্য শ্রদ্ধাভরে অস্ত্রটি গ্রহণ কবলেন। তারপব তিনি নিজেব দেহ থেকে কবচ-কুণ্ডল কেটে ইন্দ্রকে দিলেন। ইন্দ্রেব ববে সে কাটার দরুন কোন ক্ষতচিহ্ন হল না তাঁর দেহে।

এই ভাবে পাণ্ডবদের পরম শত্রু কর্ণেব শক্তিহানি কবলেন দেববাজ ইন্দ্র।

যক্ষ ও যুধিষ্ঠির

একদিন একটা হরিণেব পিছনে ছুটতে ছুটতে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন পাণ্ডবেরা। তখন তাঁবা একটা বটগাছের ছায়ায়

বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। তাঁদের তৃষ্ণাও পেয়েছিল খুব। তাই নকুল একটা উঁচু গাছের মাথায় উঠলেন, দেখলেন: বেশ খানিকটা দূরে একটি সরোবর আছে। তিনি ঐ সরোবর থেকে জল আনতে চললেন।

সরোবরে পৌঁছে নকুল জল খেতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময়ে শুনতে পেলেন, কে যেন কোথা থেকে বলছে: "বৎস, এই সরোবর আমার,—আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর জল পান করো।"

নকুল সে কথা অগ্রাহ্য করে জল পান করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এদিকে নকুলের ফিরে আসতে দেরী হচ্ছে দেখে যুধিষ্ঠির উদ্বিগ্ন হলেন। সহদেবকে তিনি নকুলের খোঁজে পাঠালেন। সহদেবও অদৃশ্য বক্তার কথা গ্রাহ্য না করে জল পান করলেন, এবং ফলে মারা পড়লেন। এবার অর্জুন গেলেন ভাইদের খোঁজে, তারপর গেলেন ভীম; তাঁদেরও ঐ একই দশা ঘটল। তখন ব্যাপার কি, তা দেখার জন্য যুধিষ্ঠির নিজে গেলেন।

সরোবরে পৌঁছে ভাইদের মৃতদেহ দেখে বিলাপ করতে লাগলেন তিনি, ভাবলেন: হয়ত কৌরবেরা এঁদের গোপনে হত্যা করেছে।

যাহোক, যুধিষ্ঠির সরোবরে নামতে গেলেন। অমনি অন্তরীক্ষ থেকে কে যেন বলে উঠল: "রাজপুত্র, আমিই তোমার ভাইদের প্রাণসংহার করেছি। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এ সরোবরের জলে হাত দিয়ো না তুমি, দিলে তুমিও প্রাণ হারাবে।"

বিস্মিত হয়ে যুধিষ্ঠির উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন: একটি বক তাঁকে ঐ কথা বলছে। তিনি তখন বললেন: "হে মহান্,

আপনি কখনই সামান্য বক নন। বকের এমন কি সাধ্য যে, ভীম অর্জুন নকুল সহদেবের মত দিগ্বিজয়ী মহাবীরদের সংহার করে? নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ আপনি।"

তখন তালতরুব মত উঁচু, পাহাড়েব মত বিরাট্, সূর্যের মত তেজস্বী এক যক্ষ এসে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠিরের সামনে। তিনিই এতক্ষণ বকেব ছদ্মবেশ ধাবণ করেছিলেন। যক্ষ বললেন: "আমিই তোমার ভাইদের মেবেছি, যুধিষ্ঠিব। আমাব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এ সরোবরের জলস্পর্শ করলে তোমারও মৃত্যু ঘটবে।"

"কি প্রশ্ন আপনার?" জানতে চাইলেন যুধিষ্ঠির।

যক্ষ প্রশ্ন করলেন: "কে সে ব্যক্তি যিনি ক্ষমতাবান্, বুদ্ধিমান্ এবং লোকসমাজে সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও জীবন্মৃত?"

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন: "যে ব্যক্তি অতিথি ভৃত্য পূর্বপুরুষ ও আত্মাব সন্তোষবিধান কবে না, সে ব্যক্তি জীবন থাকতেও মৃত।"

যক্ষ আবাব জিজ্ঞাসা করলেন: "পৃথিবীর চেয়েও বেশী ভারী কে? আকাশের চেয়েও কে বেশী উঁচু? বাতাসের চেয়েও কে যায় আগে? কার সংখ্যা তৃণেরও অধিক?"

"পৃথিবীর চেয়ে ভারী হলেন মা," বললেন যুধিষ্ঠির, "বাপ হলেন আকাশের চেয়েও উঁচু, বাতাসের চেয়েও আগে ছোটে মন, আর চিন্তার সংখ্যা তৃণেরও বেশী।"

যক্ষ এবাব প্রশ্ন করলেন: "ঘুমলেও চোখ বোজে না কার? প্রবাসী, রোগী ও মুমূর্ষুর বন্ধু কে?"

"মাছ ঘুমলেও চোখ বোজে না," উত্তর দিলেন যুধিষ্ঠির "এবং প্রবাসীর মিত্র হল সঙ্গী, রোগীর চিকিৎসক, আর মুমূর্ষুর দান।"

"কিসে ধর্ম হয়? যশ হয় কিসে? কিসেই বা স্বর্গলাভ হয়? আর, কিসে হয় সুখ?" প্রশ্ন করলেন যক্ষ।

যুধিষ্ঠির বললেন: "ধর্ম হয় দয়ায়, দানে হয় যশ, সত্য স্বর্গের সোপান, আর শিষ্টতাতেই মেলে সুখ।"

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন: "কি ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়? কি ত্যাগ করলে এড়ান যায় শোক? এবং, সুখী হওয়া যায় কি ত্যাগ করলে?"

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন: "অভিমান অর্থাৎ অহঙ্কাব ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়। শোক এড়াতে হলে ক্রোধ ত্যাগ করতে হবে। এবং, সুখী হতে হলে ত্যাগ করতে হবে লোভ।"

এবার প্রশ্ন হল: "কে মানুষের দুর্জয় শত্রু? তার কোন্ ব্যাধি অন্তহীন? প্রকৃত সাধু কে? প্রকৃত অসাধুই বা কে?"

যুধিষ্ঠির বললেন: "ক্রোধ মানুষের দুর্জয় শত্রু, লোভ তার অনন্ত ব্যাধি। প্রকৃত সাধু তিনিই যিনি সমস্ত প্রাণীব উপকার করেন, এবং নির্দয় ব্যক্তি হল অসাধু।"

আবার প্রশ্ন করেন যক্ষ: "পণ্ডিত কে? মূর্খ কে?"

যুধিষ্ঠিরের উত্তর: "ধর্মজ্ঞই পণ্ডিত, আর নাস্তিকই মূর্খ।"

যক্ষের পরের প্রশ্ন: "মিষ্ট বাক্য বললে, বিবেচনা করে কাজ করলে, অনেক বন্ধু পেলে, এবং ধর্মে মতি রাখলে, কি লাভ হয়?"

যুধিষ্ঠির বললেন: "মিষ্ট কথা বললে লোকপ্রিয় হওয়া যায়, বিবেচনা করে কাজ করলে জয়লাভ হয়, অনেক বন্ধু থাকলে লোকে সুখী হয়, এবং ধর্মে মতি থাকলে স্বর্গলাভ হয়।"

এবার যক্ষের শেষ প্রশ্ন: "সুখী কে? আশ্চর্য কি? পথ কি? বার্তা কি?"

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন: "যার দেনা নেই, যাকে বিদেশে বাস করতে হয় না, সে লোক দরিদ্র হলেও সুখী। প্রাণীরা নিত্য মরছে, এ দেখেও লোকে কিনা অমর হতে চায়!—এই আশ্চর্য।

মহাপুরুষেরা যে পথে গেছেন, তাই প্রকৃত পথ। সময় প্রতি মুহূর্তে প্রাণীদের আয়ুঃহরণ করছে—এই হল বার্তা।"

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন যক্ষ। তিনি বললেন: "তোমার উত্তরগুলি ভারী সুন্দর ও সঠিক হয়েছে। আমি তোমার মৃত ভাইদের মধ্যে কেবল একজনকে বাঁচিয়ে দিতে রাজী আছি। বল, কাকে বাঁচাব?"

যুধিষ্ঠির বললেন: "তাহলে, হে যক্ষ, আপনি ভ্রাতা নকুলের জীবনদান করুন।"

বিস্মিত হলেন যক্ষ, বললেন: "সেকি! তুমি মহাবল ভীম বা বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের জীবন না চেয়ে নকুলের জীবন চাইছ কেন, যুধিষ্ঠির? আর, নকুল ত তোমার সহোদর নন—বৈমাত্র ভাই মাত্র!"

যুধিষ্ঠির বললেন: "কুন্তী ও মাদ্রী দুজনেই আমার জননী। আমি চাই: তাঁরা উভয়েই পুত্রবতী থাকুন। তা, জননী কুন্তীর ত আমি আছি, কিন্তু নকুল-সহদেবের একজন না বাঁচলে জননী মাদ্রী পুত্রহীনা হবেন যে। তাই আমি আপনার কাছে নকুলের জীবন ভিক্ষা করছি।"

যক্ষ চমৎকৃত হলেন। "সাধু, যুধিষ্ঠির, সাধু" বলে প্রশংসাবাদ করলেন তিনি, তারপর বললেন: "আমি ধর্মদেব—তোমার ধর্মপিতা। এতক্ষণ ছদ্মবেশে পরীক্ষা করছিলাম তোমাকে। তুমি ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়েছ সে পরীক্ষায়। সত্যই তুমি ধার্মিক। আমি তোমার সব ভাইয়েরই জীবনদান করছি।"

এই বলে ভীম অর্জুন নকুল সহদেব চারজনকেই বাঁচিয়ে দিলেন ধর্মদেব। তারপর তিনি যুধিষ্ঠিরকে বর দিলেন: "তোমাদের বনবাসের বার বছর ত শেষ হয়ে এল; এবার তোমাদের এক বছর

অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। আমি তাই তোমাকে বর দিচ্ছিঃ অজ্ঞাতবাসেব সময়ে কেউ তোমাদেব চিনতে পাববে না, তা তোমবা ছদ্মবেশ ধাবণ কব আব নাই কব।"

বিরাটপর্ব

কীচক-বধ

অবশেষে শেষ হল দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী বনবাস। এবার অজ্ঞাত-বাসের পালা। সামনের একটা বছর পাণ্ডবদের এমন ভাবে বাস করতে হবে যে, কেউ যেন চিনতে পারে না তাঁদের; যদি কেউ চিনে ফেলে, তাহলে পাশার শর্তানুযায়ী আবার তাঁদের বার বছর বনবাসে ও এক বছর অজ্ঞাতবাসে কাটাতে হবে।

মৎস্যদেশের রাজা বিরাট বয়সেও যেমন প্রাচীন, তেমনি শক্তিশালী, ধর্মশীল ও বদান্য। পাণ্ডবেরা স্থির করলেন: বিরাটের রাজ্যেই অজ্ঞাতবাস করবেন তাঁরা।

সঙ্গের লোকজনদের বিদায় দিলেন পঞ্চপাণ্ডব। তারপর তাঁরা দ্রৌপদীকে নিয়ে ছদ্মবেশে পদব্রজে উপস্থিত হলেন মৎস্যদেশে। রাজধানীর কাছে একটি পাহাড়ের উপর বিশাল এক শমীবৃক্ষ ছিল। নকুল সেই গাছে উঠে একটি উঁচু ডালে তাঁদের অস্ত্র-শস্ত্রগুলি বেধে রাখলেন; তারপর তিনি একটি বৃদ্ধার শব এনে বেঁধে দিলেন ঐ গাছে, যাতে দুর্গন্ধে কেউ না গাছটির কাছে আসে। এবার পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী একে একে বিরাটের রাজধানীতে প্রবেশ করলেন।

সভা করে বসে আছেন রাজা বিরাট। এমন সময়ে ব্রাহ্মণের বেশে যুধিষ্ঠির এসে উপস্থিত হলেন তাঁর সভায়। যুধিষ্ঠির বললেন বিরাটকে: "মহারাজ, আমার নাম কঙ্ক। আশ্রয়লাভের জন্য

এসেছি আপনার কাছে। আগে আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সখা ছিলাম। ভাল পাশা খেলতে পারি আমি।”

যুধিষ্ঠিরের সুন্দর সৌম্য ও মহিমাব্যঞ্জক চেহারা দেখে মুগ্ধ হলেন বিরাট, তাছাড়া, তিনিও পাশা খেলতে ভালবাসতেন, তাই তিনি কঙ্ককে সাদরে নিজের শ্রেষ্ঠ সভাসদ্ করে নিলেন।

কিছুক্ষণ পরে কাল কাপড় পরে, হাতা খুনতি ও খোলা তরওয়াল হাতে নিয়ে বিরাট্‌কায় ভীম এসে দাঁড়ালেন রাজার সামনে। তিনি বললেন: “মহারাজ, আমার নাম বল্লব। রাজা যুধিষ্ঠিরের পাচক ছিলাম আমি। মল্লযুদ্ধেও আমার দক্ষতা আছে। আপনার কাছে আমি কাজের জন্য এসেছি।”

বল্লবকে বিরাট পাকশালার অধ্যক্ষের পদ দিলেন।

এবার ‘অরিষ্টনেমি’ নাম নিয়ে গোপের বেশে এলেন সুদেহী সহদেব। পূর্বে তিনি পাণ্ডবদের গো-পরীক্ষক ছিলেন বলে নিজের পরিচয় দিলেন। তাঁকে বিরাট পশুশালার অধ্যক্ষ করলেন।

পরম রূপবান্ বিশালকায় নপুংসকের বেশে এলেন অর্জুন, তাঁর নাম বললেন: বৃহন্নলা। বিরাট তাঁর মেয়ে উত্তরাকে নাচগান শেখানর জন্য বৃহন্নলাকে নিযুক্ত করলেন।

সূর্যের মত তেজস্বী নকুল এলেন ‘গ্রন্থিক’ নাম নিয়ে, অশ্বতত্ত্বজ্ঞ সেজে। বিরাট তাঁকে অশ্বশালার অধ্যক্ষ করলেন।

সব শেষে এলেন দ্রৌপদী বিরাটের মহিষী রানী সুদেষ্ণার কাছে। সুদেষ্ণাকে তিনি বললেন: “দেবী, আমি সৈরিন্ধ্রী। চুল বাঁধা, চন্দন বাটা, মালা গাঁথা, প্রভৃতি কাজে আমার দক্ষতা আছে। আগে আমি কৃষ্ণ-পত্নী সত্যভামা ও পাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম।”

সুদেষ্ণা সানন্দে দ্রৌপদীকে নিজের পরিচারিকা করে নিলেন।

মৎস্যরাজ্যে প্রথম দশমাস বেশ সুখেই কাটালেন পাণ্ডবেরা। তাঁদের কর্মদক্ষতায় প্রসন্ন হলেন রাজারানী, তাঁদের মধুর আচরণে সন্তুষ্ট হল রাজ্যের লোক। কঙ্কবেশী যুধিষ্ঠির বিরাটের সবচেয়ে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন।

এমন সময়ে এক দুর্ঘটনা ঘটল।

বিরাটের সেনাপতি ছিলেন কীচক। রানী সুদেষ্ণার ভাই তিনি। তিনি ছিলেন মস্ত বীর। তাঁর ভয়ে বাইরের শত্রুরা মৎস্যদেশ আক্রমণ করতে সাহস পেত না। রাজ্যমধ্যে কীচকের দোর্দণ্ড প্রতাপ--রাজা বিরাট পর্যন্ত সমীহ করে চলতেন তাঁকে।

এই কীচক একদিন দেখে ফেললেন দ্রৌপদীকে। সুন্দরী দ্রৌপদীকে দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি, তাঁকে বললেন: "আমাকে বিয়ে কর তুমি—আমি তোমার চাকর হয়ে থাকব।"

দ্রৌপদী বললেন: "ছি-ছি, একি কথা! আপনি রাজ্যের সেনাপতি, আর আমি সামান্যা সৈরিন্ধ্রী—পরিচারিকা মাত্র। তাছাড়া, পঞ্চ গন্ধর্ব আমার স্বামী—তাঁরা এ সংবাদ পেলে বধ করবেন আপনাকে। না-না, এ কুবুদ্ধি করবেন না।" এই বলে দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন সেখান থেকে।

কীচক তখন তাঁর ভগিনী রানী সুদেষ্ণার কাছে গেলেন। তাঁর পরামর্শে সুদেষ্ণা মধুজাত পানীয় আনতে দ্রৌপদীকে যেতে বললেন কীচকের বাড়িতে। দ্রৌপদী ত প্রথমে কিছুতেই যাবেন না, শেষে রানীর জেদে যেতে হল তাঁকে। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সূর্যমন্ত্র জপ করতে করতে তিনি কীচকের বাড়ি গেলেন।

নিজের বাড়িতে দ্রৌপদীকে পেয়ে তাঁকে জোর করে বিয়ে

করতে চাইলেন কীচক। দ্রৌপদী তাঁর ধর্মরক্ষার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে গিয়ে পৌঁছলেন বিরাট-রাজার সভায়। পাপিষ্ঠ কীচকও তাঁর পিছনে ছুটে এলেন এবং রাজা ও সভাসদ্‌দের সামনেই দ্রৌপদীকে চুলে ধরে পদাঘাত করলেন।

দ্রৌপদী এতক্ষণ যে সূর্যমন্ত্র জপ করছিলেন, তাতে সূর্যদেব প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁর আদেশে এক রাক্ষস প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষা করছিল দ্রৌপদীকে। কীচক দ্রৌপদীকে পদাঘাত করামাত্র রাক্ষসও বিষম পদাঘাত করল কীচককে। সে প্রচণ্ড পদাঘাতে কীচক হতচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

বল্লববেশী ভীমসেনও ছিলেন রাজসভায়। কীচকের দ্বারা দ্রৌপদীকে অপমানিতা হতে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু কঙ্কবেশী যুধিষ্ঠির তাঁকে শান্ত থাকার জন্য সঙ্কেত করলেন, এবং দ্রৌপদীকে আদেশ করলেন অন্তঃপুরে রানী সুদেষ্ণার কাছে যেতে।

যুধিষ্ঠিরের আদেশে দ্রৌপদী অন্তঃপুরে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর অন্তর জ্বলতে লাগল। কি, কীচকের লাথি খেয়েও চুপ করে থাকতে হবে তাঁকে! গভীর রাত্রে লুকিয়ে তিনি গেলেন ভীমের কাছে।

ভীমের চক্ষেও ঘুম ছিল না। অতন্দ্র আরক্ত নেত্রে বসে বসে তিনি ভাবছিলেন নিজেদের ভাগ্যের কথা। মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র তাঁরা; অল্প বয়সেই হলেন পিতৃহীন; কৈশোর থেকেই কৌরবেরা হয়ে উঠল তাঁদের বিষম শত্রু; ভীমকে বিষ খাওয়ালেন দুর্যোধন; পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা হল জতুগৃহে; তারপর আত্মপরিচয় গোপন করে ভিক্ষুকের মত পরগৃহে বাস। তারপর? তারপর বুঝি দুঃখের রাত্রি ভোর হল—বুঝি উঠল সুখের সূর্য: লক্ষ্যভেদ করলেন

অর্জুন, রাজ্য ফিরে পেলেন পাণ্ডবেরা, মহাসমারোহে রাজসূয়-যজ্ঞ করলেন তাঁরা। কিন্তু হায়, কটা দিনের জন্যই বা এই সুখ—এই আরাম! দুষ্টবুদ্ধির উদয় হল দুর্যোধনের মাথায়, কূট পাশাখেলার অনুষ্ঠান করলেন শকুনি, সর্বনাশ হল পাণ্ডবদের। কত কষ্ট ভোগ করলেন তাঁরা বনবাসে—কত বিপদের মুখে পড়লেন। তারপর এই অজ্ঞাতবাস—এই দাসত্ব! শেষে কিনা পাণ্ডব-মহিষীকে সইতে হল দুর্মতি কীচকের পদাঘাত! ক্ষোভে ক্রোধে অধৈর্য হয়ে উঠলেন ভীম।

এমন সময়ে দ্রৌপদী এলেন ভীমের কাছে। নির্যাতিতা কৃষ্ণার চোখের জল আত্মহারা করে ফেলল তাঁকে। দ্রৌপদীকে তিনি পরামর্শ দিলেন: পরদিন দ্রৌপদী যেন কীচকের কাছে গিয়ে বলেন যে, কীচককে বিয়ে করতে রাজী আছেন তিনি; তবে এ বিয়ে গোপনে করতে হবে, নইলে দ্রৌপদীর গন্ধর্ব পতিরা এ বিয়ের সংবাদ পেলে অনর্থ ঘটাবেন; তাই কীচক যেন রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে রাজকুমারীদের নাচঘরে আসেন,—নাচঘর রাত্রিবেলা ফাঁকা থাকে, সেখানেই বিয়ে হবে।

পরদিন গভীর রাত্রি। রাজকুমারীদের ফাঁকা নাচঘরে গভীর অন্ধকার। সেখানে একা বসে আছেন ভীম কীচকের প্রতীক্ষায়, ঠিক যেমন বাঘ বসে থাকে শিকারের জন্য ওঁত পেতে। যথাসময়েই এলেন কীচক—এলেন মনের আনন্দে সেজেগুজে বরের বেশে।

অন্ধকারের মধ্যে ভীমকে দেখে কীচক ভাবলেন: এই বুঝি সৈরিন্ধ্রী। তিনি এগিয়ে যেতেই ভীম তাঁকে জাপটে ধরে বললেন: "আরে দুর্মতি, গন্ধর্বের পত্নীকে বিয়ে করবার সাধ হয়েছে তোর! দাঁড়া, এখনি তোর সে সাধ মেটাচ্ছি।"

ব্যস্, দুজনে প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। দুজনেই মহাবীর,

দুজনেই নিপুণ যোদ্ধা। সম্পূর্ণ নীরবে দুই শার্দুলের মত লড়তে লাগলেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত কীচক মারা পড়লেন। তাঁর শরীরটা দুমড়ে দুমড়ে একটা মাংসের তাল বানিয়ে ফেললেন ভীম,—তখন, কোন্‌টা যে তাঁর মাথা আর কোন্‌টাই বা হাত-পা, তা বোঝার উপায় রইল না।

কীচককে মেরে ভীম নিজের বাসায় ফিরে যেতেই দ্রৌপদী নাচঘরের রক্ষীদের ডেকে এনে বললেন: "দেখ, আমার গন্ধর্ব-পতিরা দুর্বৃত্ত কীচকের কি অবস্থা করেছেন!"

তখন সারা রাজ্য জুড়ে হৈচৈ পড়ে গেল। কীচকের ছিল একশ পাঁচ ভাই। লোকে তাদের বলত: উপকীচক। তারা কীচকের মৃতদেহ সৎকার করতে নিয়ে গেল। দ্রৌপদীকেও তারা বেঁধে নিয়ে চলল কীচকের সঙ্গে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে। দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন: "ওগো গন্ধর্বেরা, রক্ষা কর, রক্ষা কর,—উপকীচকেরা আমাকে জীবন্ত দগ্ধ করার জন্য বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে।"

ভীমসেন তখন সবে শোবার উদ্যোগ করছিলেন। দ্রৌপদীর আর্তনাদ শুনে তিনি এক লাফে রাজপুরীর পাঁচিল ডিঙিয়ে উপকীচকদের সামনে উপস্থিত হলেন। কাছেই ছিল বিশাল এক তালগাছ। সেটিকে উপড়ে নিয়ে তার আঘাতে ভীম চক্ষের নিমেষে উপকীচকদের যমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

উপকীচকদের মেরে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে গোপনে স্বগৃহে ফিরলেন ভীম। দ্রৌপদীও আবার রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন। সারা রাজ্যের লোক গন্ধর্বদের ভয়ে থরহরি কম্পমান হলেন; এমন কি, স্বয়ং রাজা বিরাটও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।



সুশর্মা ও কৌরব কর্তৃক বিরাটের গোহরণ-প্রচেষ্টা

চরেরা এসে কীচকেব মৃত্যু-সংবাদ দিল দুর্যোধনকে।

ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা তখন দুর্যোধনের সভায় ছিলেন। তিনি বাবংবার আক্রমণ করেছিলেন মৎস্যদেশ, কিন্তু প্রতিবারই কীচকের হাতে পবাস্ত হয়েছিলেন। এখন কীচকেব মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, দুর্যোধনকে পরামর্শ দিলেন বিরাটের গোধন হরণ করতে।

কর্ণও সায় দিলেন সুশর্মার পবামর্শে। স্থির হল : সুশর্মা তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে মৎস্যরাজ্যের দক্ষিণ দিক্ আক্রমণ কববেন, পরদিন দুর্যোধন সসৈন্যে আক্রমণ কববেন উত্তর দিক্।

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকাল যেদিন পূর্ণ হল, সেদিন সুশর্মা মৎস্যরাজ্যের দক্ষিণ দিক্ আক্রমণ করে বিরাটেব এক লক্ষ গাভী হরণ কবলেন। সংবাদ পেয়ে বিবাট সসৈন্যে সুশর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল এবং সহদেবও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রথে চড়ে বিরাটেব সঙ্গে গেলেন।

তুমুল যুদ্ধ হল ত্রিগর্ত-বাহিনীব সঙ্গে মৎস্য-সৈন্যের। বৃদ্ধ বিরাট তরুণ যোদ্ধার মত সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে যুবক সুশর্মা তাঁকে দ্বৈবথ সমবে বন্দী করে নিজের রথে নিয়ে তুললেন। এ দেখে মৎস্যসৈন্য ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। যুধিষ্ঠির তখন ভীমকে আদেশ দিলেন বিরাটকে উদ্ধার করে আনতে।

ভীম বৃষ্টিধারাব মত তীরবর্ষণ করতে করতে আক্রমণ করলেন সুশর্মাকে। অন্য তিন পাণ্ডবও মহাবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই চার ভাই মিলে ন হাজার ত্রিগর্তীয় সৈনিকের

প্রাণবধ করলেন। ভীম সুশর্মার রথের ঘোড়াগুলিকে মেরে ফেলে তাঁকে ধরে নিয়ে এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। বিরাটও এই অবসরে সুশর্মার গদা নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে নিজের বাহিনীর মধ্যে ফিরে এলেন। যুধিষ্ঠির দয়া করে সুশর্মাকে ছেড়ে দিলেন। সুশর্মা সসৈন্যে পালিয়ে বাঁচলেন।

যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডবদের উপর ভারী সন্তুষ্ট হলেন বিরাট। তারপর গোধন আর সৈন্যসামন্ত নিয়ে তিনি ফিরে চললেন রাজধানীতে।

পরদিন দুর্যোধন মৎস্যের উত্তর দিক্ আক্রমণ করে ষাট হাজার গাভী হরণ করলেন। বিরাট তখনও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরেননি। সমস্ত সৈন্যসামন্তও তাঁরই সঙ্গে। রাজপুরীতে আছেন কেবল তরুণ কুমার উত্তর—বিরাটের কনিষ্ঠ পুত্র।

এই নতুন গোহরণের সংবাদ পেয়ে কুমার উত্তর রাজপুরীর স্ত্রীলোকদের সামনে দম্ভ করে বলতে লাগলেন: কি করবেন, তাঁর সারথি নেই,—যোগ্য সারথি পেলে সমস্ত কুরুবীরদের হারিয়ে তিনি উদ্ধার করে আনতে পারেন গোধন,—এমন কি, স্বয়ং অর্জুনও পরাস্ত হবেন তাঁর কাছে।

সৈরিন্ধ্রীবেশিনী দ্রৌপদীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উত্তরের দম্ভোক্তি শুনে মনে মনে হেসে তিনি বললেন: "কুমার, বৃহন্নলা আগে অর্জুনের শিষ্য ও সারথি ছিলেন, তিনি আপনার রথ চালাতে পারবেন।"

তখন বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে সারথি করে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চললেন উত্তর। রাজকুমারীরা বলে দিলেন বৃহন্নলাকে:

"কুরুবীরদের হারিয়ে তাঁদের সুন্দর সুন্দর উত্তরীয়গুলি নিয়ে এস, বৃহন্নলা,—তা দিয়ে পুতুল সাজাব আমরা।"

মৃদু হেসে বৃহন্নলা বললেন: "তা কুমার উত্তর যদি কুরুবীরদের হারাতে পারেন, তবে আনব বৈকি সে সব উত্তরীয়।"

রণক্ষেত্রে পৌঁছে উত্তরের চক্ষুঃস্থির! যেদিকেই তাকান যায়, সেদিকেই কেবল কুরুসৈন্য। সৈন্যের পর সৈন্য, তারপর সৈন্য,—যেন বিশাল সমুদ্রের সংখ্যাতীত তরঙ্গরাজি! উত্তরের হৃৎকম্প আরম্ভ হল, অর্জুনকে রথ ফিরিয়ে নিতে বললেন তিনি। কিন্তু অর্জুন কিছুতেই তা করতে সম্মত হলেন না। ক্ষত্রিয় বীর প্রাণ থাকতে কখনও কি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে পারেন? উত্তর তখন রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে পালাতে লাগলেন। অর্জুনও ছুটলেন তাঁর পিছু পিছু।

কিছু দূর গিয়ে অর্জুন উত্তরকে ধরে ফেললেন, অনেক করে বোঝালেন তাঁকে, কিন্তু উত্তর কোন মতেই সাহসী হলেন না যুদ্ধ করতে। শেষে স্থির হল: অর্জুন নিজে যুদ্ধ করবেন, আর উত্তর হবেন তাঁর সারথি।

তখন উত্তরকে নিয়ে অর্জুন গেলেন সেই শমীবৃক্ষের কাছে, যার উপরে অস্ত্রশস্ত্র বেঁধে রেখেছিলেন পাণ্ডবেরা। ঐ সব অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র দেখে শঙ্কিত ও বিস্মিত হলেন উত্তর। বৃহন্নলার সত্য পরিচয় জানতে চাইলেন তিনি। অর্জুন তখন পাণ্ডবদের প্রকৃত পরিচয় উত্তরকে জানালেন এবং সে পরিচয় গোপন রাখতে বলে দিলেন।

রথচূড়া থেকে উত্তরের সিংহকেতন খুলে নিয়ে নিজের কপিধ্বজ স্থাপন করলেন অর্জুন। তারপর তিনি উত্তরকে সারথি করে গাণ্ডীব-ধনুঃতে টঙ্কার দিতে দিতে দেবদত্ত-শঙ্খে মহারব তুলে বেগে রথ ছোটালেন কুরুসৈন্যের দিকে।

ঐ গাণ্ডীব-টঙ্কার ও শঙ্খধ্বনি শুনে চমকিত হলেন ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রমুখ প্রবীণ কুরুবীরেরা। তাঁরা বুঝতে পারলেন: এ নিশ্চয়ই অর্জুন। তখন সমস্ত কুরুসৈন্যকে চার ভাগে ভাগ করা হল: এক ভাগ নিয়ে দুর্যোধন ফিরে চললেন হস্তিনায়, আরেক ভাগ চলল বিরাটের গোরুগুলিকে নিয়ে, বাকী দু ভাগ নিয়ে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ প্রভৃতি মহাবীরেরা রইলেন অর্জুনকে ঠেকানর জন্য।

দুর্যোধনকে পালাতে দেখে অর্জুন প্রথমেই তীর ছুড়ে তাঁর গতিরোধ করলেন, তারপর আটকালেন গোরুগুলিকে। এবার কুরুবীরদের সঙ্গে তার সংগ্রাম আরম্ভ হল। কর্ণ দুর্যোধন কৃপ দ্রোণ অশ্বত্থামা ও ভীষ্ম একে একে প্রাণপণে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাস্ত হলেন। শেষে অর্জুনের সম্মোহন-বাণে সমস্ত কুরুসৈন্য হতচেতন হয়ে পড়ল কেবল বৃদ্ধ ভীষ্ম কোন রকমে নিজের চেতনা বজায় রাখলেন। এই অবসরে কুরুবীরদের মূল্যবান্ উত্তরীয়গুলি নিয়ে এলেন উত্তর। তারপর গোধন উদ্ধার করে অর্জুন ফিরে চললেন বিরাট-নগরে।

অর্জুন আবার সারথি সেজে বসলেন রথে, এবং উত্তরকে বলে দিলেন: তিনি যেন রাজধানীতে ফিরে গিয়ে জানান যে, এক দেবকুমারের সাহায্যেই যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে তাঁর।

এদিকে সুশর্মাকে হারিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে বিরাট শুনলেন যে, বৃহন্নলাকে সারথি করে কুমার উত্তর একাকী গেছেন কুরুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। এ সংবাদে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি।

এমন সময়ে সংবাদ এল: ছোট কুমার যুদ্ধে জয়লাভ করে

সমস্ত গোধন উদ্ধার করে নিবাপদে ফিরে আসছেন। যুধিষ্ঠির বললেন ঃ "বৃহন্নলা যাঁর সারথি, জয় ত তাঁর হবেই।"

তখন বিরাটের আদেশে বিজয়ী কুমাবের অভ্যর্থনার জন্য সারা রাজধানী সাজান হল। আম্রপল্লবে পুষ্পস্তবকে মঙ্গল-কলসে রঙীন পতাকায় আলোয় বাজিতে ঝলমল করে উঠল বিরাট-নগর। আবম্ভ হল নাচ-গান-বাজনা। আর, এই আনন্দের মধ্যে কঙ্ককে নিয়ে বিরাট বসলেন পাশা খেলতে।

খেলতে খেলতে বিরাট বললেন ঃ "কঙ্ক, আজ কি আনন্দ আমাব! বিশ্ববিখ্যাত কুরুবীবদেব পরাজিত কবে আমাব বংশেব গৌরব বৃদ্ধি করছেন কুমাব উত্তর।"

যুধিষ্ঠিব বললেন ঃ "যখনই শুনেছি ঃ বৃহন্নলা কুমারেব সঙ্গে গেছেন, তখনই বুঝেছি ঃ জয় অনিবায। বৃহন্নলা ছাড়া আর কে পবাস্ত করতে পারেন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ প্রভৃতি মহাবীরদেব?"

যুধিষ্ঠিরের এ কথায় বিষম ক্রুদ্ধ হলেন বিরাট। "একি, কঙ্ক! আমি যতবারই কুমাব উত্তরেব পশংসা করি, তুমি ততবারই সে কথা উড়িয়ে দিয়ে প্রশংসা কব কিনা নপুংসক বৃহন্নলার! তোমার শাস্তি হওয়া উচিত," এই বলে তিনি তাঁর হাতের পাশা সরোষে ছুড়ে মারলেন যুধিষ্ঠিরেব মুখে।

পাশার আঘাতে ঝর্‌ঝর্ কবে বক্ত পড়তে লাগল যুধিষ্ঠিরের নাক দিয়ে। এমন সময়ে সংবাদ এল ঃ কুমার উত্তব রাজধানীতে পৌঁছেছেন, বৃহন্নলাকে নিয়ে তিনি রাজার কাছে আসছেন। যুধিষ্ঠির তখন দৌবারিককে কাছে ডেকে তাব কানে কানে বললেন ঃ "এখন এখানে আসতে দিয়ো না বৃহন্নলাকে, কারণ তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যুদ্ধ ছাড়া অন্যভাবে যে ব্যক্তি আমার রক্তপাত করবেন, তাঁকে তিনি বধ করবেনই।"

উত্তর একাই প্রবেশ করলেন সভাগৃহে। যুধিষ্ঠিরের অবস্থা দেখে চমকে উঠলেন তিনি, জানতে চাইলেন : কোন্ পাপিষ্ঠ করেছে এ কাজ ?

বিরাট সব কথা খুলে বললেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের মুখে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছিলেন উত্তর। তাই তিনি সভয়ে সখেদে বললেন যে, এ কাজ অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে বিরাটের এবং তিনি যদি সবংশে মরতে না চান তবে এখনি ক্ষমাপ্রার্থনা করুন কঙ্কের কাছে।

বিরাট তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চাইলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠির প্রসন্নমুখে বললেন : ক্ষমা তিনি আগেই করেছেন মহারাজকে।

উত্তর তখন বিরাটকে বললেন যে, এক দেবকুমারের সাহায্যেই তাঁর রণজয় হয়েছে, সে দেবকুমার এখন অন্তর্হিত হয়েছেন— দুই-একদিনের মধ্যে নিজেই দেখা দেবেন।

পরদিন সকালবেলা সভাগৃহে ঢুকেই বিরাট অবাক্—কঙ্ক বসে আছেন সিংহাসনে, তাঁর পাশে সৈরিন্ধ্রী বল্লব বৃহন্নলা গ্রন্থিক ও অরিষ্টনেমি।

সক্রোধে জিজ্ঞাসা করলেন বিরাট : "একি আচরণ তোমার, কঙ্ক ? সিংহাসনে বসেছ তুমি !"

কুমার উত্তরও এসেছিলেন সভাগৃহে। তিনি পিতাকে পাণ্ডবদের প্রকৃত পরিচয় দিলেন। তখন বিরাটের সে কি উল্লাস ! যুধিষ্ঠিরের কাছে তাঁর সে কি ক্ষমা চাওয়ার ঘটা !

তখন বিরাট-রাজার অনুরোধে তাঁর মেয়ে উত্তরার সঙ্গে বিয়ে স্থির হল অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর। অভিমন্যুর মা সুভদ্রা ছিলেন

কৃষ্ণের বোন। পাণ্ডবদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের সময়ে অভিমন্যু ছিলেন তাঁর মাতুলালয় দ্বারকায়। লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে তাঁকে বিরাট-নগরে আনান হল। তাঁর সঙ্গে এলেন কৃষ্ণ বলরাম এবং দ্বারকার অন্য সব মহাবীরেরা।

আবার আনন্দের বান ডাকল বিরাট-নগরে। আবার বাজি পুড়ল, পতাকা উড়ল, আলো জ্বলল, বাঁশি বাজল, মঙ্গল-কলস স্থাপিত হল তোরণে, ফুল ছড়ান হল, ছড়ান হল টাকাকড়ি পথে পথে গরিব-দুঃখীর জন্য। কত লোক খেল, কত লোকে পেল কত উপহার। বিয়ে হয়ে গেল অভিমন্যু-উত্তরার।

উদ্যোগপর্ব

সেনাসংগ্রহ

অভিমন্যুর বিয়েতে যে সব রাজরাজড়া নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, তাঁরা যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পরামর্শ দিয়ে গেলেন, কারণ তাঁরা জানতেন যে, বিনা যুদ্ধে দুর্যোধন কিছুতেই ফিরিয়ে দেবেন না পাণ্ডবদের রাজ্য।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না যুদ্ধ করার, কিন্তু কি করেন—রাজ্য থাকতেও রাজ্যহারা হয়ে ভিখারির মত চিরজীবন ত আর প্রবাসে প্রবাসে ঘুরে বেড়ান যায় না। তাই তিনি এক দিকে যেমন দূত পাঠালেন হস্তিনায় সন্ধির প্রস্তাব করে, অন্য দিকে তেমনি সেনাসংগ্রহে উদ্যোগী হলেন।

সেকালে জ্ঞানে বুদ্ধিতে বীরত্বে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সবারই ধারণা ছিল: কৃষ্ণ যার সহায়, জয় তার অবশ্যম্ভাবী। কুরুপাণ্ডব উভয়েরই ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব ছিলেন কৃষ্ণ। মা-কুন্তী ছিলেন কৃষ্ণের পিসী, আবার কৃষ্ণপুত্র শাম্ব ছিলেন দুর্যোধনের জামাতা। তাই তিনি স্বেচ্ছায় কোন পক্ষে যোগ দিতে পারেন না,—সেকালের নিয়মানুযায়ী যে পক্ষ তাঁকে আগে আমন্ত্রণ করবে, সেই পক্ষেই যোগ দেবেন তিনি। তবে তাঁর মনের ইচ্ছা: তিনি ধার্মিক পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দেন।

এ হেন কৃষ্ণকে স্বপক্ষে পাবার জন্য অর্জুন গেলেন দ্বারকায়।

সেখানে পৌঁছে তিনি দেখেন: দুর্যোধন তাঁর আগেই উপস্থিত হয়েছেন!

কৃষ্ণ তখন ঘুমচ্ছিলেন। তাঁর শিয়রে চমৎকার একটি স্বর্ণ-সিংহাসন পাতা। দুর্যোধন গিয়ে বসলেন সেই সিংহাসনে, আর অর্জুন বসলেন বিনীতভাবে করজোড়ে কৃষ্ণের পায়ের কাছে।

ঘুম ভাঙল কৃষ্ণের। প্রথমেই তিনি দেখতে পেলেন অর্জুনকে, তারপর দুর্যোধনকে। তাঁরা দুজনেই কৃষ্ণকে নিজ নিজ পক্ষে যোগ দিতে অনুরোধ করলেন।

দুর্যোধন বললেন: "কৃষ্ণ, আমি আগে এসেছি। সুতরাং, আমারই অনুরোধ রক্ষা করা তোমার উচিত।"

কৃষ্ণ বললেন হেসে: "মহারাজ, তুমি আগে এসেছ, সন্দেহ নেই, কিন্তু অর্জুনকেই আমি আগে দেখেছি। সে যাহোক, তোমাদের দুজনকেই আমি সাহায্য করব। তবে অর্জুন তোমার চেয়ে বয়সে ছোট, তাই তাঁকেই আগে সন্তুষ্ট করা আমার উচিত।"

এই বলে কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন: "শোন, অর্জুন, নারায়ণ নামে আমার দশ কোটি সেনা আছে। তাদের প্রত্যেকেই আমার তুল্য বলশালী। বল: তুমি এই নারায়ণী-সেনা চাও, না আমাকে চাও? আমি কিন্তু যুদ্ধ করব না, কেবল উপদেশ দেব।"

অর্জুন বললেন: "কৃষ্ণ, তুমি যুদ্ধ কর আর নাই কর, তোমাকেই চাই আমি। পাণ্ডবেরা যুদ্ধজয়ের চেয়ে রাজ্যোদ্ধারের চেয়ে কৃষ্ণ-সঙ্গই বেশী কামনা করে। যুদ্ধকালে তুমি আমার সারথি হয়ো: এই শুধু আমার অনুরোধ।"

কৃষ্ণ বললেন: "তবে তাই হোক, আমি পাণ্ডবপক্ষেই উপদেষ্টা হয়ে থাকব—অর্জুনের সারথি হব। আর, রাজা দুর্যোধন, তুমি আমার নারায়ণী-সেনা নাও।"

দুর্যোধন ত ভারী আনন্দিত। তিনি ভাবলেন: আমি ত দশ কোটি নারায়ণী-সেনা পেলাম; আর, পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে পেয়েও পেল না, কারণ তিনি যুদ্ধ করবেন না। অর্জুন কি মূর্খ—বলে কিনা: 'কৃষ্ণ, তুমি যুদ্ধ কর আর নাই কর, তোমাকেই চাই আমি!'

দুর্যোধন নারায়ণী-সেনা নিয়ে হস্তিনায় ফিরলেন, কৃষ্ণকে নিয়ে অর্জুন এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে।

এদিকে উভয় পক্ষ থেকেই দেশবিদেশের রাজাদের কাছে যুদ্ধের নিমন্ত্রণ পাঠান হয়েছিল। মদ্ররাজ শল্য ছিলেন নকুল-সহদেবের মাতুল। মহাবীর তিনি—প্রায় কৃষ্ণের সমতুল্য। এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে তিনি আসছিলেন ভাগিনেয় পাণ্ডবদের সাহায্যের জন্য।

এ সংবাদ পেয়ে উদ্বিগ্ন হলেন দুর্যোধন। শল্যের মত মহাবীর পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিলে বিষম বিপদে পড়বেন কৌরবেরা। যেমন করেই হোক, শল্যকে স্বপক্ষে আনতে উদ্যোগী হলেন তিনি। এই সঙ্কল্প করে তিনি শল্যের অভ্যর্থনার জন্য পথিমধ্যে নানারূপ বিচিত্র ব্যবস্থা করে রাখলেন, কিন্তু সবাইকে বলে দিলেন: শল্যকে কেউ যেন না জানায় যে তিনিই এ সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন।

বিশাল বাহিনী নিয়ে পথশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়ে আসছেন শল্য। পথিমধ্যে এমন চমৎকার অভ্যর্থনা পেয়ে অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন তিনি, বললেন: "কে করেছে এ মনোরম ব্যবস্থা? তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। তার মনোবাসনা পূর্ণ করব আমি—বর দেব তাকে।"

কাছেই আত্মগোপন করে ছিলেন দুর্যোধন। শল্যের কথা শুনে তিনি সামনে এসে বললেন: "তাহলে, মামা, পাণ্ডবদের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে আমার পক্ষে যোগ দিন আপনি।"

শল্য আর কি করবেন—নিজে থেকেই বর দিতে চেয়েছেন যে। তিনি বললেন: "তাই হবে, দুর্যোধন, তবে এখন আমি একবার যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করে আসব।"

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দুর্যোধনের কারসাজির কথা জানালেন শল্য। যুধিষ্ঠির শুনে বললেন: "এতে আর আপনার দোষ কি, মামা? তবে আমার একটি অনুরোধ: যুদ্ধের সময়ে আপনি কর্ণের সারথি হয়ে এমন সব কথা বলবেন তাঁকে, যেন তাঁর তেজবীর্য ও মনোবল কমে যায়।"

শল্য রাজী হয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

ক্রমে ক্রমে কৌরবপক্ষে সংগ্রহ করা হল এগার অক্ষৌহিণী সেনা, আর পাণ্ডবপক্ষে সাত অক্ষৌহিণী। সেকালে এক অক্ষৌহিণী সেনাতে থাকত এক লক্ষ ন হাজার পদাতিক, পঁয়ষট্টি হাজার ছ শ ঘোড়া, একুশ হাজার আট শ সত্তরটি হাতি, আর একুশ হাজার আট শ সত্তরখানা রথ।

সন্ধিচেষ্টায় দৌত্য

শান্তিকামী যুধিষ্ঠির শেষ মুহূর্তেও চেষ্টা করলেন যদি বিনা যুদ্ধে রাজ্য ফিরে পান। তাই তিনি সন্ধির প্রস্তাব করে দ্রুপদের পুরোহিতকে পাঠালেন হস্তিনায়।

দ্রুপদ-পুরোহিত হস্তিনায় গিয়ে অনেক করে বোঝালেন কৌরবদের। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর প্রভৃতি ধার্মিকেরা ত এ গৃহযুদ্ধের বিরোধী ছিলেনই, তারপর দ্রুপদ-পুরোহিতের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ

শুনে ধৃতরাষ্ট্রেরও বুঝি সুমতি হল! তিনিও এ যুদ্ধ না করার জন্য দুর্যোধনকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু দুর্মতি দুর্যোধন কোন সদুপদেশেই কর্ণপাত করলেন না। এর উপর আবার দ্রুপদ-পুরোহিত ও পাণ্ডবদের পক্ষে নানা অপমানকর কথা বলতে লাগলেন কুমন্ত্রী কর্ণ। হতাশ হয়ে দ্রুপদ-পুরোহিত হস্তিনা ত্যাগ করলেন।

কদিন পরে ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে সঞ্জয় এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে।

সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে বললেন: "মহারাজ, আপনি ধার্মিক। দুর্বৃত্ত দুর্যোধনের চক্রান্তে অনেক কষ্ট পেয়েছেন আপনারা। তবু এতদিন ধর্মের মুখ চেয়ে নীরবে সব সয়েছেন। এখন যুদ্ধ করে সে ধর্ম নষ্ট করা কোন মতেই উচিত হবে না আপনার—তা যদি চিরদিন আপনাকে রাজ্যহারা হয়ে থাকতে হয়, তবুও। এই কথাই অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে বলার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাদের মঙ্গল-কামনা করেন।"

যুধিষ্ঠির বললেন: "এ কেমন কথা, সঞ্জয়! অন্ধরাজই বা আমাদের কেমন মঙ্গলকামী! দুর্যোধন চিরকালই আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে—আমাদের সে বিষ দিয়েছে, চেষ্টা করেছে পুড়িয়ে মারতে, কপট পাশাখেলায় হারিয়ে আমাদের রাজ্য আত্মসাৎ করে বনবাসে পাঠিয়েছে। তবু ধর্মের মুখ চেয়ে আমি সব সয়েছি, চেষ্টা করেছি যাতে না জ্ঞাতিবিরোধ বাধে। এখনও কি আমরা আমাদের রাজ্য ফিরে পাবার চেষ্টা করলে ধর্মভ্রষ্ট হব? এ কেমন উপদেশ? কেমন মঙ্গল-কামনা এ?"

সঞ্জয় এ কথার উত্তর খুঁজে পেলেন না।

যুধিষ্ঠির বলতে লাগলেন: "সঞ্জয়, ক্ষত্রিয় রাজপুত্র আমরা—ন্যায়যুদ্ধ করা আমাদের ধর্ম। তবে, স্বরাজ্য উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ

করলে কেন অধর্ম হবে আমাদের ? জ্যেষ্ঠতাত যা বলে পাঠিয়েছেন, তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের মঙ্গল তিনি চান না—তাঁর দুর্মতি পুত্রদেরই তিনি সমর্থন করছেন। তবু, তাঁর সম্মানরক্ষার জন্য আমি যুদ্ধ না করতে প্রস্তুত আছি। তুমি তাঁকে বলো : তিনি আমাদের পাঁচ ভাইকে মাত্র পাঁচখানি গ্রাম দিন, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব আমরা—যুদ্ধ করব না ; নচেৎ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।”

হস্তিনায় ফিরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে সব কথা বললেন সঞ্জয়। পাণ্ডবপক্ষে যে সৈন্যবল সংগৃহীত হয়েছিল, তারও বিবরণ তিনি দিলেন। শুনে ধৃতরাষ্ট্রের হৃৎকম্প উপস্থিত হল : একেই ত পঞ্চপাণ্ডব মহাবীর—তাঁদের মধ্যে ভীমার্জুন ভুবনবিজয়ী, এঁদের সঙ্গে মহাপুরুষ কৃষ্ণও যখন যোগ দিয়েছেন, তখন কে পারবে তাঁদের পরাজিত করতে ?

ভীত অন্ধরাজ আবার বোঝালেন দুর্যোধনকে, অনেক তিরস্কার করলেন তাঁকে। কিন্তু দুর্যোধনের সেই এক কথা : পাণ্ডবদের সঙ্গে কিছুতেই একত্রে বাস করতে পারব না,—পাঁচখানা গ্রাম কেন, পাঁচটি ধূলিকণাও দেব না তাঁদের।

এমন সময়ে সংবাদ এল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসছেন কৌরবসভায় পাণ্ডবদের দূত হয়ে।

কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য হস্তিনার পথে পথে অট্টালিকাসমূহের অলিন্দে অলিন্দে সমুদ্র-তরঙ্গের মত লোকেরা ভিড় করে দাঁড়াল। কৃষ্ণের মনোরঞ্জন করে তাঁকে স্বপক্ষে আনার জন্য তাঁর অভ্যর্থনার বিবিধ আয়োজন করেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু কৃষ্ণ কোন দিকে দৃক্‌পাত না করে সোজা বিদুরের গৃহে গিয়ে অতিথি হলেন।

পরদিন প্রভাতে কৌরবসভায় গেলেন কৃষ্ণ। ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক করে বোঝালেন তিনি, বললেন : অন্ধরাজ ইচ্ছা করলেই এ গৃহযুদ্ধ

বন্ধ করতে পারেন। কৌরব-পাণ্ডব মিলিত হলে পৃথিবীর কোন শক্তিই তাঁদের পরাজিত করতে পারবে না ; অথচ, এই যুদ্ধ হলে কৌরব বা পাণ্ডব এক পক্ষ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হবে এবং প্রজাও মারা পড়বে বহু ; সুতরাং, ধৃতরাষ্ট্রের কর্তব্য ঃ এ যুদ্ধ বন্ধ করা।

কৃষ্ণ আরও বললেন ঃ পাণ্ডবেরা ধার্মিক। কৌরবদের কুচক্রে নানা নির্যাতন তাঁরা সহ্য করেছেন এতদিন। পাশাখেলার যে শর্ত ছিল, তা তাঁরা পালন করেছেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের পিতৃতুল্য,—তিনিও এবার শর্তপালন করুন—রাজ্য ফিরিয়ে দিন পাণ্ডবদের।

দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললেন কৃষ্ণ ঃ "মহারাজ, মহৎ বংশে জন্মেছ তুমি, সর্বশাস্ত্রে তুমি পণ্ডিত—সর্বগুণে গুণী। তুমি কেন এমন অন্যায় আচরণ করছ? ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধেরা, তোমার পক্ষের বহু রাজা, এমন কি তোমার ভাই বিকর্ণ ও বিবিংশতি পযন্ত সন্ধিকামনা করছেন। তুমি কেন কুবুদ্ধি করে বংশনাশে উদ্যত হয়েছ? পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রকেই মহারাজ করবেন, তোমাকেই যুবরাজ করবেন,—তুমি তাঁদের অর্ধরাজ্য দাও।"

কিন্তু দুর্যোধনের সেই এক কথা ঃ "আমি জীবিত থাকতে এক কণা মাটিও পাবে না পাণ্ডবেরা।"

কৃষ্ণ তখন কুরুবৃদ্ধদের বললেন যে, দুর্মতি দুর্যোধন যখন কিছুতেই সদুপদেশ শুনবেন না, তখন তাঁকে তাঁরা বন্দী করে পাণ্ডবদের হাতে দিন—সন্ধি স্থাপিত হোক।

কৃষ্ণের কথায় উদ্বিগ্ন হলেন ধৃতরাষ্ট্র। দুর্যোধন-জননী গান্ধারীকে তিনি সভায় ডাকিয়ে আনালেন। মহীয়সী গান্ধারী অনেক বোঝালেন দুর্যোধনকে, অনেক উপদেশ দিলেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হল। দুর্যোধন সভা থেকে উঠে গিয়ে শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের

সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, কৃষ্ণকে বন্দী করবেন তাঁরা।

দুর্যোধনের অভিসন্ধি বুঝতে বিলম্ব হল না কৃষ্ণের। তিনি সতর্ক হয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করলেন এবং সভামধ্যে দুর্যোধনের অভিসন্ধি প্রকাশ করে দিলেন।

তখন ধার্মিক কুরুবৃদ্ধেরা দুর্যোধনকে নিন্দা করতে লাগলেন, ধৃতরাষ্ট্রও সমুচিত তিরস্কার করলেন পুত্রকে, কৃষ্ণ আবারও বোঝালেন তাঁকে; কিন্তু কিছুতেই মন গলল না দুর্যোধনের,—সে যেন মরুভূমি—যতই জল ঢালা হোক না কেন, বালি ভেজে না!

কৃষ্ণ বুঝলেন: সন্ধি অসম্ভব—যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি তখন পাণ্ডবদের কাছে ফিরে গেলেন।

পাণ্ডবেরা দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেনাপতি করে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে সৈন্যসমাবেশ করলেন। দুর্যোধনও তাঁর একাদশ অক্ষৌহিণী নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এলেন। তাঁর পক্ষে সেনাপতি হলেন মহামতি মহারথ ভীষ্ম।

এই সময়ে একদিন ভীষ্ম কৌরবপক্ষীয় মহাবীরদের কার কেমন ক্ষমতা বর্ণনা করছিলেন। তিনি ইচ্ছা করেই কর্ণকে নিতান্ত ছোটখাট বীর বলে বর্ণনা করলেন। এতে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোষণা করলেন যে, ভীষ্ম যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন তিনি অস্ত্রধারণ করবেন না,—ভীষ্মের মৃত্যুর পর তিনি দুর্যোধনের স্বপক্ষে যুদ্ধ করবেন। এই বলে সভাগৃহ ত্যাগ করলেন কর্ণ।

এই ব্যাপারে দুর্যোধন অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন। ভীষ্ম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, কর্ণ যুদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই, কারণ

ভীষ্ম নিজে নিত্য পাণ্ডবপক্ষের দশ হাজাব কবে সাধারণ সৈনিক এবং এক হাজার করে মহাবীরকে বধ করবেন ; তবে দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীকে তিনি স্ত্রীলোক বলে গণ্য করেন, তাই শিখণ্ডী তাঁব প্রাণসংহাব করতে উদ্যত হলেও তিনি কখনই অস্ত্রাঘাত কববেন না তাঁকে।

ভীষ্মপর্ব

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা

পরদিন আরম্ভ হল পাণ্ডবে কৌরবে মহাযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে। ব্যাসদেবের বরে দিব্যদৃষ্টি পেলেন সঞ্জয়—হস্তিনার কুরুসভাগৃহে বসে তিনি নিত্য অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধকাহিনী বর্ণনা করে শোনাতে লাগলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হল। কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম ভাগে পুবমুখী হয়ে দাঁড়াল পাণ্ডবসৈন্য, আর কৌরবেরা দাঁড়াল পুব ভাগে পশ্চিমমুখী হয়ে।

কৌরব-সেনাপতি মহাবীর ভীষ্ম সিংহনাদ করে মহারবে তাঁর রণশঙ্খ ধ্বনিত করলেন। অন্যান্য বীরেরাও সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি করলেন। সেই মিলিত শঙ্খধ্বনিতে, সৈন্যদের কোলাহলে, যুদ্ধাশ্বগুলির হ্রেষারবে, হস্তীদের বৃংহতিতে, রথসমূহের ঘর্ঘরশব্দে আকাশ-বাতাস আলোড়িত হল। পাখিরা ভয় পেয়ে কলরব করতে করতে বাসা ছেড়ে শূন্যে উড়তে লাগল, গাছগুলি দুলতে লাগল, জলাশয়গুলি হল বিক্ষুব্ধ,—মনে হল যেন প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠেছে।

অর্জুন তখন তাঁর সারথি কৃষ্ণকে বললেন: “হে কৃষ্ণ, পাণ্ডব ও কৌরব বাহিনীর ঠিক মধ্যস্থলে আমার রথ রাখ। দেখি: কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে আমাকে।”

অর্জুনের নির্দেশমত রথস্থাপন করলেন কৃষ্ণসারথি। অর্জুন দেখলেন: কৌরবপক্ষে যাঁরা আছেন, সবাই তাঁর আত্মীয়স্বজন—কেউ বা ভাই, কেউ মামা, কেউ শ্বশুর, কেউ পিতামহ, কেউ গুরু, কেউ বা অমনি কোন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি।

এ দেখে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন অর্জুন। তাঁর হাত থেকে বিখ্যাত গাণ্ডীবধনুঃ খসে পড়ার উপক্রম করল। তিনি সখেদে বললেন: "কৃষ্ণ, আমি এ যুদ্ধ করতে পারব না। রাজ্য ত সামান্য—সারা পৃথিবীর লোভেও আঘাত হানতে পারব না স্বজনদের উপর।" এই বলে তিনি ধনুঃ ত্যাগ করে রথের উপরে বসে পড়লেন।

অর্জুন বললেন:

'ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥'

—যুদ্ধ করে স্বজন হত্যা করার মধ্যে কোন মঙ্গল দেখি না আমি। হে কৃষ্ণ, আমি জয় চাই না, রাজ্য চাই না, সুখ চাই না। "না-না, এ যুদ্ধ করতে পারব না আমি" বললেন তিনি।

অর্জুনের মনোবিকার দেখে উদ্বিগ্ন হলেন কৃষ্ণ, তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: "মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়"—হে কুন্তীপুত্র, ক্লীব হয়ো না—পৌরুষ হারিয়ো না,—ওঠ, ধনুক ধর—যুদ্ধ কর।

অর্জুন তবু ওঠেন না। কৃষ্ণ তাঁকে বোঝালেন: দেহ তুচ্ছ বস্তু, কারণ দেহের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দেহের মধ্যে যে আত্মা আছে, তাই হল জীবের প্রকৃত সত্তা। আত্মার ক্ষয় নেই, কারণ তা পরমাত্মারই অংশমাত্র। আর,

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

—পরমাত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তাঁর অতীত নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই; তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ, দেহ হত হলেও তিনি হত হন না—অক্ষয় অব্যয় তিনি!

আরও বোঝালেন কৃষ্ণ ঃ

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥"

—মানুষ যেমন ছেঁড়া কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরে, আত্মাও তেমনি পুরন দেহ ছেড়ে নতুন দেহে আশ্রয় নেয়। দেহের ক্ষয় আছে, কিন্তু আত্মা অক্ষয় অমর,—মৃত্যু আত্মাব রূপান্তর মাত্র।

তাছাড়া, 'ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে'—ধর্মযুদ্ধের চেয়ে ক্ষত্রিয়েব পক্ষে শ্রেয়ঃ আর কিছু নেই। সুতরাং, অর্জুনেব উচিত ধর্মযুদ্ধে পাপাত্মা কৌরবদেব বধ কবা।

কৃষ্ণ বলতে লাগলেন ঃ "হে অর্জুন, তুমি ক্ষত্রিয়। পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ক্ষত্রধর্ম। সে ধর্ম লঙ্ঘন কবো না তুমি। জেন ঃ 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্মো ভয়াবহঃ' —স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে অর্থাৎ নিজেব স্বাভাবিক কর্মসাধন করতে গিয়ে মবাও ভাল, কিন্তু পরোধর্ম অর্থাৎ নিজের পক্ষে অস্বাভাবিক কর্মে হাত দেওয়া বিপজ্জনক।

"এ পৃথিবীতে কেই বা কার? আর কেই বা কি কবে? নিখিল সৃষ্টি পরমেশ্বরের খেলামাত্র। সুতরাং, হে অর্জুন, 'সর্বধর্মং পরিত্যাজং মামেকং শরণং ব্রজ'—সমস্ত ধর্ম সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে কেবল আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের শরণ নাও—তাঁর কাজ কবে চল।

"আর কাজই শুধু করো—ফলাফলের দিকে তাকিয়ো না। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—কর্মেই তোমার অধিকার—ফলাফলে নয়। ফলাফল সর্বদা ও সর্বতোভাবে পরমেশ্বরের হাতে। সুতরাং, হে অর্জুন, মোহ দূর কর, ওঠ, ধনুক তুলে নাও হাতে, বিনাশ কর শত্রুকুল।"

কৃষ্ণের উপদেশে মোহ ঘুচল অর্জুনের। নব উদ্যমে বর্ধিত তেজে তিনি শরাসন হাতে নিয়ে রথের উপরে উঠে দাঁড়ালেন।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ

মহৎ ব্যক্তির চরিত্রের একটি প্রধান মাধুর্য হল: শিষ্টাচার। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরিত্রও শিষ্টাচারেব গুণে পরম রমণীয় ছিল।

যুদ্ধ আসন্ন দেখে বর্ম খুলে রেখে রথ থেকে নামলেন যুধিষ্ঠির। তারপর তিনি পায়ে হেঁটে গেলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যের কাছে, হাত জোড় করে বললেন: "আমি ক্ষত্রধর্মানুসারে আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি; আপনারা আমার গুরুজন—আমাকে অনুমতি দিন এ যুদ্ধ করতে।"

যুধিষ্ঠিরের এ শিষ্টাচার ও বিনয়ে আন্তরিক সন্তুষ্ট হলেন কুরু-বৃদ্ধেরা। শত্রুপক্ষের কর্ণধার হয়েও যুধিষ্ঠিরকে তাঁরা আশীর্বাদ করে বললেন: "তোমার মহত্ত্বে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেছি আমরা। আশীর্বাদ করি যুদ্ধে তুমি জয়ী হও।"

গুরুজনদের আশীর্বাদ লাভ করে যুধিষ্ঠির স্বীয় বাহিনীর ব্যূহ-মধ্যে ফিরে গেলেন। তারপর উচ্চৈঃস্বরে কুরু-সৈনিকদের সম্বোধন করে বললেন: আপনাদের মধ্যে এমন যদি কেউ থাকেন, যিনি আমাদের পক্ষে আসতে চান, তিনি আসুন,—তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নেব আমরা।"

যুধিষ্ঠিরের এ আহ্বান শুনে দুর্যোধনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যুযুৎসু এসে যোগ দিলেন পাণ্ডবপক্ষে।

তারপর আরম্ভ হল ঘোর যুদ্ধ। উভয় পক্ষের বীরগণ মহা-বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই রক্তে আর মৃতদেহে

বীভৎস মূর্তি ধারণ করল রণক্ষেত্র। এমন সময় কৌরবপক্ষীয় মহাবীর মদ্ররাজ শল্য বিরাটপুত্র উত্তরের প্রাণসংহার করলেন। তা দেখে উত্তরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্বেত উল্কাবেগে আক্রমণ করলেন শল্যকে। তাঁর আক্রমণে শল্য বিপন্ন হয়ে পড়লেন এবং শত শত কুরুবীর মারা পড়তে লাগলেন। তখন স্বয়ং ভীষ্ম এসে বধ করলেন শ্বেতকে।

বিরাটের দুই বীর পুত্রের মৃত্যুতে হাহাকার পড়ে গেল পাণ্ডবপক্ষে, আর কৌরবপক্ষে জাগল আনন্দোচ্ছ্বাস। এমন সময়ে সন্ধ্যা হওয়ায় প্রথম দিনের যুদ্ধ শেষ হল।

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে কৌরবপক্ষের নিদারুণ ক্ষতি হল। ভীমার্জুন শত শত শত্রুসৈন্যের প্রাণনাশ করলেন। অর্জুনের বিক্রমে ভীষ্ম পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। 'ত্রাহি ত্রাহি' রব উঠল কৌরববাহিনীতে। কৌরবদের ভাগ্য ভাল যে, এমন সময়ে সূর্যাস্ত হওয়ায় সেদিনের মত যুদ্ধ অবসান হল।

কঠিন সংগ্রাম আরম্ভ হল তৃতীয় দিবসে। উভয় পক্ষই প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

এদিন ভীম ও দুর্যোধন পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। তাঁদের যুদ্ধ দেখে মনে হল যেন সঙ্ঘর্ষ হচ্ছে দুই উল্কাপিণ্ডে। দুই চিরশত্রু যথাসাধ্য শক্তিতে পরস্পরকে অস্ত্রাঘাত করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ভীমের শরাঘাতে রথের উপরে অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন দুর্যোধন। তাঁর সারথি তাড়াতাড়ি রথ নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল, নইলে এদিনই বোধ হয় দুর্যোধনের প্রাণসংশয় হত।

চেতনা ফিরে পেয়ে দুর্যোধন ভীষ্মের কাছে গিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন: "পিতামহ, আপনার মত বীরশ্রেষ্ঠ আমার সেনাপতি;

গুরু দ্রোণ ও কৃপের মত মহারথ আমার সহায় ; আমার পক্ষে সৈন্যসংখ্যাও বেশী। তবু, পাণ্ডবদের বিক্রমে চক্ষে অন্ধকার দেখছি আমরা। আপনারা মন দিয়ে যুদ্ধ করছেন না বলেই ত পাণ্ডবেরা এত ক্ষতি করতে পারছে আমাদের। যদি আগে জানতাম যে, আপনারা এমনি করবেন, তবে কর্ণকেই সেনাপতি করতাম আমি।"

দুর্যোধনের এই তিরস্কারে ক্রোধে ও অভিমানে জ্বলে উঠলেন ভীষ্ম। দুর্যোধনকে তিনি বললেন: "রাজা, তোমাকে আমি অনেকবার বলেছি যে, পাণ্ডবদের জয় করা দেবতাদেরও অসাধ্য। কিন্তু তুমি আমার সমস্ত উপদেশ উপেক্ষা করে যুদ্ধে নেমেছ। এখন আর আমি কি করি, বল? তাছাড়া, আমি ত বৃদ্ধও হয়ে পড়েছি।"

পিতামহকে তিরস্কার করতে গিয়ে নিজেই এমন মর্মান্তিক ভাবে তিরস্কৃত হয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন রাজা দুর্যোধন। তা দেখে ভীষ্মের করুণা হল। সস্নেহে বললেন তিনি: "তুমি দুঃখিত হয়ো না, দুর্যোধন ; আজ আমি একাকী পরাস্ত করব পাণ্ডবদের।"

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা—তার ত ব্যত্যয় হবে না কখনও। তাই দুর্যোধন ও তাঁর ভাইয়েরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন পিতামহের প্রতিজ্ঞা শুনে।

প্রচণ্ড তেজে সংগ্রাম আরম্ভ করলেন ভীষ্ম। মধ্যাহ্নের সূর্যের মত, ঝটিকায় বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত, আহত শার্দূলের মত তাঁর তেজ। সে তেজের সামনে দাঁড়াতে পারল না পাণ্ডবসৈন্য—শীঘ্রই তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে দলে দলে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগল। শত চেষ্টা করেও অর্জুন তাদের ফেরাতে পারলেন না।

তখন অর্জুন স্বয়ং পিতামহ ভীষ্মের সম্মুখীন হলেন। ভীষ্ম তখন যুদ্ধ করছেন মহাতেজে, কিন্তু অর্জুন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন মৃদুভাবে, কারণ তখনও সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হয়নি তাঁর মন—

তখনও গুরুজন ও আত্মীয়-স্বজনকে কঠিন অস্ত্রাঘাত করতে দ্বিধা করছেন তিনি। অর্জুনের এই মৃদু যুদ্ধ পাণ্ডবদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হল—ভীষ্মের শরাঘাতে পীড়িত হয়ে পাণ্ডব-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

এ দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন অর্জুনের সারথি কৃষ্ণ। তিনি ভুলে গেলেন যে প্রতিজ্ঞা করেছেন: কুরুক্ষেত্রেব এ গৃহযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না। সুদর্শন-চক্র হাতে নিয়ে রথ থেকে তিনি নামলেন, তারপর ভীষ্মকে বধ করার জন্য মহাবেগে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। নিজেদের ধ্বংস আসন্ন দেখে আর্তনাদ করে উঠল কৌরবসৈন্য।

ভীষ্ম কিন্তু ভীত হলেন না মোটেই। তিনি অস্ত্রনিক্ষেপ বন্ধ করে কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন: "এস, পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, তুমি এস। বধ কর তুমি আমাকে। তোমার হাতে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে শুধু ইহলোকে নয়, পরলোকেও ধন্য হব আমি।"

কৃষ্ণকে স্বীয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতে দেখে অত্যন্ত বিব্রত হলেন অর্জুন। তিনি তাড়াতাড়ি রথ থেকে নেমে পড়ে ছুটে গিয়ে সবলে কৃষ্ণের পা দুখানি চেপে ধরলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আর তিনি মৃদুভাবে যুদ্ধ করবেন না—মোহগ্রস্ত হয়ে থাকবেন না আর,—এবার থেকে সকল দ্বিধা সকল সঙ্কোচ দূর করে প্রাণপণ যুদ্ধ করে ধ্বংস করবেন কৌরবসৈন্য।

এ কথা শুনে শান্ত হলেন কৃষ্ণ। তিনি আবার রথে ফিরে এসে অশ্বচালনা করতে লাগলেন।

এদিনের যুদ্ধে অর্জুন একাই দশ হাজার কৌরবসৈন্যকে যমালয়ে পাঠালেন।

ভীষ্মের শরশয্যা

চতুর্থ দিনের যুদ্ধে দুর্যোধনের আটটি ভাই প্রাণ হারালেন ভীমের হাতে। এদিন ভীমপুত্র রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচও প্রবল সংগ্রাম করলেন। রাক্ষসী মায়াবলে যুদ্ধ করে তিনি বিপর্যস্ত করলেন কৌরব-বাহিনীকে।

পঞ্চম দিনে কৌরবপক্ষে যেমন ভীষ্ম ও ভূরিশ্রবা প্রচণ্ড সংগ্রাম করলেন, পাণ্ডবপক্ষেও তেমনি অর্জুন একাই পঁচিশ হাজার শত্রুসৈন্য সংহার করলেন।

ষষ্ঠ দিনে ভীমসেন মদমত্ত হস্তীর মত শত্রুদলন করতে লাগলেন। স্বয়ং রাজা দুর্যোধন তাঁকে বাধা দিতে এলেন। কিন্তু ভীমের ভীম শরাঘাতে শীঘ্রই তাঁর প্রাণসংশয় হয়ে উঠল—তাঁর ধনুঃ কাটা পড়ল, সারথি আহত হল, রথের চারটি ঘোড়া প্রাণ হারাল, এবং তিনি নিজে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। এ দেখে কৃপাচার্য দ্রুতবেগে এসে তাঁকে নিজের রথে তুলে নিলেন।

এদিন অর্জুনপুত্র অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রও কম বিক্রম প্রকাশ করলেন না। বয়সে কিশোর হয়েও তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের চারটি ছেলেকে বধ করলেন।

সপ্তম দিনের প্রধান ঘটনা হল দ্রোণাচার্যের বাণে বিরাটপুত্র শঙ্খের জীবনহানি। অষ্টম দিনে ধৃতরাষ্ট্রের আরও চব্বিশজন পুত্রকে নিহত করলেন ভীম।

নবম দিনে বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কালান্তক যমের মত যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর শরাঘাতে পাণ্ডবপক্ষের বহু বীর প্রাণ হারালেন, মহারথেরাও রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পালাতে লাগলেন, পাণ্ডব-বাহিনীতে হাহাকার পড়ে গেল। অবশেষে সূর্যাস্ত হওয়ায় উভয় পক্ষ সেদিনের মত রণে ক্ষান্ত হলেন।

নবম দিনের যুদ্ধশেষে পাণ্ডব-শিবিরে মন্ত্রণা-সভা বসল। ভীষ্মের অমানুষিক পরাক্রম দেখে দুশ্চিন্তায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণকে তিনি বললেন: "হৃষীকেশ, বীরশ্রেষ্ঠ পিতামহ ভীষ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কখনও জয়ী হতে পারব না আমরা। সুতরাং, অনর্থক আর যুদ্ধ না করে আমার বনে যাওয়াই উচিত।"

কৃষ্ণ নানা ভাবে সান্ত্বনা দিলেন যুধিষ্ঠিরকে। তখন যুধিষ্ঠির বললেন আবার: "পিতামহ আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি দুর্যোধনের পক্ষে থাকলেও সর্বদা আমাকে হিতকর মন্ত্রণা দেবেন। তিনি সত্যবাদী। আমি যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তবে নিশ্চয়ই তিনি নিজেই নিজের বধের উপায় বলে দেবেন আমাকে। কিন্তু, কৃষ্ণ,—"

দ্বিধায় সঙ্কোচে কণ্ঠরোধ হল যুধিষ্ঠিরের। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি পুনরায় বললেন: "কৃষ্ণ, বালক-বয়সে পিতৃহীন হয়েছি আমরা। পিতামহ পরম স্নেহে পালন করেছেন আমাদের। তিনি আমাদের প্রকৃত সুহৃৎ, প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী। আজ আমাদের স্বার্থের খাতিরে সেই স্নেহপরায়ণ দেবচরিত্র পিতামহকে বধ করতে হবে ভেবে নিজেকে নিজেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করছে আমার।"

বিধিমতে উপদেশ দিয়ে যুধিষ্ঠিরের দ্বিধা দূর করলেন কৃষ্ণ। তারপর, অনেক আলাপ-আলোচনার পর স্থির হল: সেদিন রাত্রে পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণ নিরস্ত্র হয়ে দেখা করবেন ভীষ্মের সঙ্গে, যাতে তাঁরই কাছে তাঁর বধের উপায় জানতে পারেন।

ভীষ্মকে প্রণাম করে নীরবে নতশিরে দাঁড়িয়ে রইলেন যুধিষ্ঠির—কোন কথাই বলতে পারলেন না। আর বলবেনই বা কি করে? কোন্ লজ্জায় তিনি জিজ্ঞাসা করবেন এই পরম স্নেহশীল পূতচরিত্র পলিতকেশ বৃদ্ধকে: "হে পিতামহ, আপনার বধের উপায় বলে দিন

আমাদের, তা না হলে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারব না আমরা?" ছি-ছি।

অবশেষে ভীষ্মের সস্নেহ সাদর অভ্যর্থনায় কিছুটা মনোবল ফিরে পেলেন যুধিষ্ঠির। জড়িতকণ্ঠে তিনি বললেন: "পিতামহ, আমরা কি উপায়ে জয়ী হব, বলে দিন। আপনার মত বীরকেশরী কৌরবদের সহায় থাকা পর্যন্ত আমাদের ত জয়লাভের কোনই আশা নেই।"

যুধিষ্ঠিরের মনোভাব বুঝতে বিলম্ব হল না মহামতি ভীষ্মের। তিনি ধীরভাবে বললেন যুধিষ্ঠিরকে: "পাণ্ডুপুত্র, তোমার কথা সত্য। আমি যতক্ষণ অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করব, ততক্ষণ জয়ের আশা নেই তোমাদের। তবে আমাকে নিরস্ত্র করাব উপায় আছে, শোন, তোমাদের বলছি।"

পাণ্ডবেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে ভীষ্মের কথা শুনতে লাগলেন। তিনি বললেন: "তোমাদের সেনাদলে দ্রুপদ-রাজের ছেলে মহাবীর শিখণ্ডী আছেন। শিখণ্ডী এখন পুরুষ হলেও, ওঁর জন্ম হয়েছিল স্ত্রীলোকরূপে। আমি তাই ওঁকে স্ত্রীলোক বলেই গণ্য করি।"

এই বলে ভীষ্ম নিজেই পাণ্ডবদের জানিয়ে দিলেন কি ভাবে তাঁকে জয় করতে পারবেন তাঁরা। ভীষ্ম বললেন: "তোমরা ত জান, স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করি না। শিখণ্ডীর বিরুদ্ধেও আমি অস্ত্রধারণ করব না। সুতরাং, শিখণ্ডীকে আমার সামনে রেখে যুদ্ধ করো তোমরা। তাহলে আমি অস্ত্র হানতে পারব না, আর সেই সুযোগে অস্ত্র হেনে আমাকে পরাস্ত করতে পারবে তোমরা।"

মহামতি ভীষ্মের অলৌকিক মহত্ত্বে অভিভূত হয়ে পড়লেন পাণ্ডবেরা। তাঁকে প্রণাম করে তাঁরা নিজেদের শিবিরে ফিরে এলেন।

আরম্ভ হল দশম দিনের যুদ্ধ। ভীমপরাক্রম ভীষ্মের প্রতাপে পাণ্ডবপক্ষের সহস্র সহস্র যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রেই শেষশয্যা গ্রহণ করল। ভীষ্মের সঙ্গে যখন কিছুতেই এঁটে ওঠা সম্ভব হল না, তখন তাঁর সামনে শিখণ্ডীকে রেখে অর্জুন ও অন্যান্য পাণ্ডব-বীরেরা তাঁর প্রতি অস্ত্রক্ষেপণ কবতে লাগলেন।

অসংখ্য সুতীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ হল ভীষ্মের দেহ। তাঁর দেবকান্তি বেয়ে দবদব ধারায় শোণিত ঝরতে লাগল। তবু, পাছে শিখণ্ডীকে আঘাত করে, এই ভয়ে তিনি অস্ত্রনিক্ষেপে বিরত রইলেন ; রণক্ষেত্র ত্যাগ করেও তিনি যেতে পারলেন না, কারণ তাতে ক্ষত্রধর্ম লঙ্ঘন করা হবে। অবশেষে সারাদিনব্যাপী বাণপ্রহারে তাঁর সর্বাঙ্গ রাঙা হয়ে গেল এবং তিনি অবসন্ন হয়ে রথ থেকে ভূতলে পড়ে গেলেন। আকাশের সূর্যও তখন পশ্চিমে ঢলে পড়ার উদ্যোগ কবছে।

কুরুকুলতিলক বীববব ভীষ্মেব পতনে কি কৌরব কি পাণ্ডব, উভয় পক্ষেবই সমস্ত লোক বিষাদে মূহ্যমান হয়ে পড়লেন। শত্রুমিত্রভেদে সকলেই হাহাকাব করতে লাগলেন ; দ্রোণাচার্য ত মূর্ছিত হয়েই পড়লেন। সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ হল।

উভয় পক্ষের বাজগণ বর্ম ত্যাগ করে ভীষ্মেব কাছে গেলেন। আকাশচ্যুত মধ্যাহ্ন-সূর্যের ন্যায় ভূতলশায়ী হয়ে আছেন ভীষ্ম। তাঁর সর্বাঙ্গ বাণবিদ্ধ—কেবল মাথাটিতেই কোন বাণ বেঁধেনি। তাঁর পৃষ্ঠে যে সব শর বিদ্ধ হয়েছে, সেগুলি তাঁকে ভূতল থেকে কিছু ঊর্ধ্বে রেখেছে, কিন্তু অবাণবিদ্ধ মাথাটি নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। এতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল, তাই তিনি সমাগত বীরদের কাছে উপাধান চাইলেন।

ভীষ্মের অনুরোধ শুনে রাজন্যবর্গ তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁরা সব বহুমূল্য কোমল বালিশ এনে দিলেন ভীষ্মকে। তা দেখে

ভীষ্ম মৃদু হেসে বললেন : "এসব উপাধান কি বীরশয্যার উপযুক্ত ?" তারপর তিনি অর্জুনকে সম্বোধন করে বললেন : "অর্জুন, তুমি আমাকে শরশয্যায় শায়িত বীরের যোগ্য উপাধান দাও।"

এ কথা শুনে অর্জুন গাণ্ডীব হাতে নিলেন, তারপর ভীষ্মের মাথার নিচের মাটিতে তিনটি বাণ ছুড়লেন। সেই বাণ তিনটির উপরে ভীষ্মের মস্তক সুস্থিরভাবে স্থাপিত হল। ভীষ্ম সাধুবাদ দিলেন অর্জুনকে, অন্য সকলে মুগ্ধ হলেন।

ভীষ্ম তখন বললেন : "এখন দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত আমি এই শরশয্যায় শুয়ে থাকব। যখন উত্তরায়ণ আরম্ভ হবে—যখন সূর্য উত্তর দিকে গেলে প্রতপ্ত হবে সর্বলোক, তখন আমি আমার পিতৃদত্ত 'ইচ্ছামৃত্যু'-বরের প্রভাবে দেহত্যাগ করব।"

দুর্যোধনের আদেশে বহু বৈদ্য এসেছিলেন ভীষ্মের শরীর থেকে শরসমূহ তুলে ফেলে তাঁকে আরোগ্য করতে। কিন্তু ভীষ্ম চিকিৎসা গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না, তিনি বললেন : "আমি বীরের কাম্য মৃত্যু লাভ করছি—তাই আর বাঁচতে চাই না। আমার মৃত্যুর পর এই শরসমেতই আমার দেহ দাহ করো তোমরা।"

ভীষ্মের কথা শুনে সমাগত বীরগণ অত্যন্ত শোকার্ত হলেন; সজলচক্ষে তাঁরা নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেলেন।

পরদিন প্রভাতে আবার সকলে ভীষ্মকে দেখতে গেলেন। ভীষ্ম পিপাসার্ত হয়েছিলেন, তিনি তাঁদের কাছে পানীয় জল চাইলেন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ স্বর্ণভৃঙ্গারে করে সুশীতল নির্মল বারি নিয়ে এলেন। তা দেখে ভীষ্ম বললেন : "অর্জুন, সাধারণ মানুষের পানীয় জলে আমার পিপাসা মিটবে না আর। তুমি আমাকে শরশয্যায় শায়িত বীরের পেয় পানীয় দাও।"

ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বের মৃত্তিকা লক্ষ্য করে বাণ ছুড়লেন অর্জুন। সেই বাণ মৃত্তিকা ভেদ করে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকাগর্ভ থেকে একটি সুমিষ্ট শীতল জলধারা উঠে এসে পড়তে লাগল ভীষ্মের মুখে। সেই জল পরম তৃপ্তিসহকারে পান করলেন তিনি।

ভীষ্ম তখন দুর্যোধনকে গৃহযুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য নানা উপদেশ দিলেন, বহু অনুরোধ করলেন। কিন্তু কিছুতেই দুর্যোধনের সঙ্কল্পের পরিবর্তন হল না। অবশেষে বীরগণ শিবিরে ফিরে গেলেন।

সকলে ভীষ্মের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর কর্ণ একাকী এলেন ভীষ্মের কাছে। কর্ণ সজলনেত্রে প্রণাম করলেন ভীষ্মকে।

ভীষ্ম পরম স্নেহে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন ঃ "কর্ণ, তুমি এসেছ, আমি বড় খুশী হয়েছি। তোমার বীরত্ব, তোমার ধর্ম্মপরায়ণতা, তোমার দান অতীব প্রশংসনীয়—জগতে এর তুলনা নেই। কিন্তু, কর্ণ, নীচস্বভাব দুর্যোধনের সংসর্গে থেকে তুমিও পরশ্রীকাতর হয়েছ—অকারণে দ্বেষ কব তুমি পাণ্ডবদের। তাই আমি তোমার তেজোহানি করার জন্য ইচ্ছাপূর্বক তোমাকে নিম্ন-স্তরের বীর বলে বর্ণনা করেছিলাম। বৎস, তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগ দাও, তাহলে দুর্যোধন এ যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হবেন।"

কর্ণ বললেন ঃ "মহাবাহু, আপনি যা বললেন, তা সত্য। কিন্তু আমি দুর্যোধনকে কথা দিয়েছি যে, তাঁকে রক্ষা করব। এখন তাঁকে ত্যাগ করলে ধর্মে পতিত হব আমি। হে পিতামহ, আপনি আমাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিন।"

ভীষ্ম বললেন ঃ "হে রাধেয় কর্ণ, একান্তই যদি তুমি এ নিদারুণ শত্রুতা ত্যাগ না করতে পার, তবে, আমি প্রসন্ন মনে অনুমতি

দিচ্ছি, তুমি যুদ্ধ কর। আশীর্বাদ করি, তুমি ক্ষত্রিয় বীরের কাম্য মৃত্যু লাভ কর—রণক্ষেত্র তোমার শেষশয্যা হোক।"

ভীষ্মকে অভিবাদন করে সরোদনে বিদায় নিলেন কর্ণ। আর, কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরে বাণশয্যায় শুয়ে উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন মহামতি মহাবীর ভীষ্ম।

দ্রোণপর্ব

অভিমন্যু-বধ

ভীষ্মের পতনের পর কৌরবপক্ষের সেনাপতি হলেন সর্বাস্ত্রবিশারদ বীরাগ্রগণ্য গুরু দ্রোণাচার্য।

একাদশ দিনেও তুমুল যুদ্ধ হল উভয় পক্ষে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটল না তেমন।

দ্বাদশ দিনে কৌরবপক্ষের বীর ভগদত্ত প্রচণ্ড সংগ্রাম করলেন। তিনি ছিলেন প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামক রাজ্যের অধীশ্বর। পর্বতের মত বিশাল এক হাতিতে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন তিনি। ঐ হাতিটি হল ঐরাবতের বংশধর, যে ঐরাবতে চড়ে দেবরাজ ইন্দ্র দানবদলন করেছিলেন। ঐ হাতিতে চড়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ বহুসংখ্যক পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাকে নিহত করলেন। অবশেষে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল তাঁর।

অর্জুনের বাণে ভগদত্তের হস্তীর বর্ম কাটা গেল। এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন ভগদত্ত। অর্জুনকে লক্ষ্য করে বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। মূর্তিমান্ মৃত্যুর মত অর্জুনের দিকে মহাবেগে ছুটে এল সে মহাস্ত্র। পাণ্ডব-বাহিনী সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, ভাবল: এবার বুঝি প্রাণ হারালেন অর্জুন!

এমন সময়ে অর্জুনকে আড়াল করে দাঁড়ালেন কৃষ্ণ। সবেগে সমাগত বৈষ্ণবাস্ত্রটিকে বুক পেতে গ্রহণ করলেন তিনি। অস্ত্রটি মালার আকার ধারণ করে দুলতে লাগল কৃষ্ণের কণ্ঠে!

এ দেখে অর্জুন ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন: "একি! কৃষ্ণ, তুমি না

প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে, যুদ্ধ করবে না? তবে কেন এ অস্ত্রটি নিবারণ করলে তুমি?”

কৃষ্ণ তখন বললেন যে, অতি মারাত্মক এ অস্ত্রটি। যাকে লক্ষ্য করে এটি নিক্ষিপ্ত হবে, তার প্রাণনাশ অনিবার্য। একমাত্র কৃষ্ণই পারেন এ অস্ত্র নিবারণ করতে, কারণ অস্ত্রটি তাঁরই। তিনি এটি দিয়েছিলেন নরকাসুরকে। নরকাসুরের কাছ থেকে ভগদত্ত অস্ত্রটি পান।

যাহোক, বৈষ্ণবাস্ত্র ব্যর্থ হলে ভগদত্ত নির্বীর্য হয়ে পড়লেন। তখন অর্জুন তাঁকে তাঁর হস্তীসমেত বধ করলেন।

ভগদত্তের মৃত্যুতে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন দুর্যোধন। শিবিরে ফিরে গিয়ে তিনি দ্রোণের কাছে অনুযোগ করলেন যে, আচার্য মৃদু ভাবে যুদ্ধ করছেন বলেই কৌরবদের এত ক্ষতি করতে পারছেন পাণ্ডবেরা। এ অনুযোগে লজ্জিত হলেন দ্রোণ, প্রতিজ্ঞা করলেন: পরদিন অবশ্যই তিনি পাণ্ডবপক্ষের কোন মহারথকে সংহার করবেন, তবে দুর্যোধন যেন অর্জুনকে মূল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেন।

ত্রয়োদশ দিনে প্রায় অভেদ্য ভাবে সৈন্যবিন্যাস করলেন দ্রোণ। সে বিন্যাসের নাম: চক্রব্যূহ। তখন সংশপ্তক নামে এক দল অটলপ্রতিজ্ঞ বীর যুদ্ধ আরম্ভ করলেন অর্জুনের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অর্জুন মূল রণক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়লেন।

অর্জুন দূরে সরে যাওয়ায় চমৎকার সুযোগ পেলেন দ্রোণাচার্য। লঘুহস্তে চোখা চোখা বাণ হেনে দলে দলে পাণ্ডবসৈন্যকে যমালয়ে পাঠাতে লাগলেন তিনি। শীঘ্রই অবস্থা এমন হল যে, চক্রব্যূহ ভেদ না করতে পারলে আর রক্ষা নেই পাণ্ডবদের।

এখন, কে ভেদ করবে চক্রব্যূহ ? ক'জনেই বা জানে এ ব্যূহ-ভেদ করতে ? পাণ্ডবপক্ষে জানেন কেবল কৃষ্ণ আর অর্জুন। তা তাঁরা ত এখন অনেক দূরে গিয়ে পড়েছেন।

আর ব্যূহভেদ করতে জানেন অর্জুনপুত্র অভিমন্যু। কিন্তু তিনি প্রবেশের কৌশল জানলেও, বেরিয়ে আসার কৌশল জানতেন না। এমন সাঙ্ঘাতিক ব্যূহের মধ্যে ঢুকে যদি বেরন না যায়, তবে ত মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

কিশোর অভিমন্যু, বয়স তাঁর মোটে ষোল বছর। পাণ্ডবদের বড় স্নেহের ধন তিনি—নয়নের মণি। তাঁকে কি করে একাকী পাঠান যাবে ঐ মারাত্মক ব্যূহমধ্যে, যে ব্যূহ রক্ষা করছেন দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা প্রভৃতি অজেয় বীর ? কিন্তু উপায়ই বা কি—নইলে পাণ্ডব-বাহিনী সমূলে ধ্বংস হবে যে! তাই আত্মরক্ষার চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে অনুরোধ করলেন ঐ ব্যূহভেদ করতে। অভিমন্যুকে আশ্বাস দিয়ে বললেন তিনি : "বৎস, ভয় নেই, তোমার পিছনে পিছনে আমরাও ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করব।"

বীর কিশোর অভিমন্যু তৎক্ষণাৎ নির্ভয়ে চক্রব্যূহ ভেদ করতে চললেন। সহজেই তিনি ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করলেন—কুরুবীরেরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাঁর পথরোধ করতে পারলেন না। ভীম ও অন্য সব পাণ্ডব-বীর সসৈন্যে অভিমন্যুর পিছনে পিছনে ব্যূহে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুর্যোধনের ভগিনীপতি জয়দ্রথ তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ করলেন। মহাদেব জয়দ্রথকে যে বর দিয়েছিলেন, আজ তা ফলল—আজ জয়দ্রথ একাই অর্জুন বাদে অন্য চার পাণ্ডবকে সসৈন্যে পরাস্ত করলেন।

এদিকে চক্রব্যূহে ঢুকে মহাবিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন অভিমন্যু। সহস্র সহস্র কুরুসৈন্য তাঁর অস্ত্রাঘাতে প্রাণ হারাল।

শল্যপুত্র রুক্মরথ এবং দুর্যোধনপুত্র লক্ষ্মণকেও বধ করলেন তিনি। তখন দুর্যোধন এবং দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা প্রভৃতি কৌরবপক্ষের ছজন প্রধান বীর একসঙ্গে আক্রমণ করলেন ঐ কিশোরকে।

সেকালে ঐ ভাবে একজন বীরের সঙ্গে একাধিক বীরের যুদ্ধ করা অন্যায় বলে গণ্য করা হত। কিন্তু প্রাণের দায়ে দুর্যোধন অমনি অন্যায় যুদ্ধ করেই অভিমন্যুকে বধ করার আদেশ দিলেন।

অভিমন্যু তবু কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে মহাবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি অমন যে ছজন মহারথ, তাঁরাও কিশোর বীরের অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হয়ে 'ত্রাহি ত্রাহি' করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত দ্রোণের পরামর্শে কর্ণ পিছন থেকে অভিমন্যুর ধনুঃ কেটে ফেললেন। তবু কি তাঁর বিক্রম কমে? তিনি খড়্গ হাতে নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শত্রুরা পর্যন্ত মুগ্ধ হল তাঁর বীরত্ব দেখে।

তখন দ্রোণের অস্ত্রাঘাতে ভগ্ন হল অভিমন্যুর খড়্গ। কিশোর বীর এবার চক্র হাতে নিলেন। কিন্তু চক্রও কাটা পড়ল তাঁর। তখন তিনি তাঁর শেষ সম্বল গদা হাতে নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এমন সময়ে দুঃশাসনপুত্র গদাঘাত করলেন অভিমন্যুর মাথায়। সে আঘাতে অভিমন্যু প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। পাণ্ডবপক্ষে হাহাকার পড়ে গেল।

এমনি করে কৌরবপক্ষের ছয় মহারথ এবং অন্যান্য বহু বীর একত্রে পরিবেষ্টন করে অন্যায় ভাবে হত্যা করলেন অভিমন্যুকে। এমনি করে বীর অর্জুনের বীরপুত্র দুরপনেয় কলঙ্ক লেপে দিলেন কৌরব রথীদের বীরত্বে—মরেও অমর হলেন কিশোর বীর অভিমন্যু!

জয়দ্রথ-বধ ও ঘটোৎকচের মৃত্যু

সংশপ্তকদের বধ করে সন্ধ্যাবেলায় শিবিরে ফিরে এলেন অর্জুন। শিবিরে ফিরেই তিনি অভিমন্যু-বধের সংবাদ পেলেন। এ সংবাদ পেয়ে শোকে অধীর হয়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি ক্রোধে কম্পিতকলেবর হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন: "যে জয়দ্রথ পাণ্ডবদের ব্যূহপ্রবেশে বাধা দিয়ে বীর অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়েছে, তাকে আমি কাল বধ করবই। যদি কাল সূর্যাস্তের আগে পাপী জয়দ্রথকে সংহার না করতে পারি, তবে অগ্নিতে প্রবেশ করে জীবন বিসর্জন দেব আমি।"

অর্জুনের এ প্রতিজ্ঞার সংবাদ পেয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হল জয়দ্রথের। দ্রোণাচার্য ও দুর্যোধন তাঁকে আশ্বাস দিলেন: সমস্ত কুরুসৈন্য মিলে তাঁর প্রাণরক্ষা করবে।

পরদিন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে এক অদ্ভুত ব্যূহ তৈরী করে তার মধ্যে জয়দ্রথকে লুকিয়ে রাখলেন দ্রোণ। প্রধান প্রধান কুরুবীরেরা জয়দ্রথকে ঘিরে রইলেন, যেন সেদিন সূর্যাস্তের আগে অর্জুনের হাতে না পড়েন তিনি।

এদিন শোকার্ত অর্জুন প্রবল তেজে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। অবলীলাক্রমে কুরুব্যূহ ভেদ করে কুরুবীরদের একে একে পরাস্ত করতে করতে তিনি এগিয়ে চললেন জয়দ্রথের দিকে। কিন্তু সমুদ্রতরঙ্গের মত অনন্ত কুরুসৈন্য—এর যেন শেষ নেই আর, শেষ নেই! দলে দলে কুরুসৈন্য এসে বাধা দিতে লাগল অর্জুনকে। এক এক দলকে পরাজিত করে তিনি এগতে না এগতেই আরেক দল এসে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়। তবু মহাবীর অর্জুন এগিয়ে চলতে লাগলেন।

এমনি করে অবশেষে সূর্য অস্তাচলে যাবার উপক্রম করল।

অথচ, জয়দ্রথের দেখাও পেলেন না অর্জুন। এতে পাণ্ডবেরা যেমন উদ্বিগ্ন ও ভীত হয়ে পড়লেন, কৌরবেরা তেমনি হলেন আনন্দিত, কারণ আজ সূর্যাস্তের আগে জয়দ্রথকে যদি না বধ করতে পারেন অর্জুন, তবে ত তাঁকে জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করে প্রাণবিসর্জন দিতে হবে।

কৃষ্ণ দেখলেন ঃ বিষম সঙ্কট। তিনি তখন এক কৌশল অবলম্বন করলেন—সুদর্শন-চক্র দিয়ে সূর্যকে আবৃত করে ফেললেন তিনি। অমনি লুপ্ত হল সূর্যালোক, সবাই ভাবল ঃ সূর্য অস্ত গেছে! সঙ্গে সঙ্গে বিজয়-বাদ্য বেজে উঠল কৌরবপক্ষে, আর পাণ্ডবেবা দুঃখে ভয়ে মুষড়ে পড়লেন।

জয়দ্রথের তখন স্ফূর্তি দেখে কে! বুক ফুলিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন অর্জুনেব সামনে। এ দেখে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন ঃ "এখনি জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ কর। কিন্তু, সাবধান, ওর মাথা কেটে মাটিতে ফেলো না।"

বিস্মিত হয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কেন?"

"সে এক অদ্ভুত কাহিনী" বললেন কৃষ্ণ; "জয়দ্রথের জন্মকালে দৈববাণী হল যে, কোন শত্রু রণস্থলে এই শিশুর শিরশ্ছেদ করবে। এই দৈববাণী শুনে জয়দ্রথের পিতা রাজা বৃদ্ধক্ষত্র অভিশাপ দিলেন ঃ 'যে ব্যক্তি আমার পুত্রের ছিন্নমস্তক ভূমিতে ফেলবে, তার নিজের মস্তকও তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হবে।' সুতরাং, তুমি যদি জয়দ্রথের মাথা মাটিতে ফেল, তবে তোমার মাথাও খণ্ড খণ্ড হয়ে ফেটে যাবে।"

এই বলে কৃষ্ণ অর্জুনকে পরামর্শ দিলেন যে, জয়দ্রথের মাথা কেটে তিনি যেন মাটিতে না ফেলেন—তিনি যেন জয়দ্রথের ছিন্ন শির বাণে বাণে উড়িয়ে নিয়ে বনে তপস্যারত বৃদ্ধক্ষত্রের কোলের উপরে ফেলেন।

অর্জুন তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ শরে জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ করলেন, তারপর সেই ছিন্ন শির বাণে বাণে উড়িয়ে নিলেন আকাশপথে। বনমধ্যে তপস্যারত ছিলেন বৃদ্ধ রাজা বৃদ্ধক্ষত্র ; তাঁরি কোলের উপর গিয়ে পড়ল জয়দ্রথের ছিন্ন শির ; অমনি বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তক শতধা বিদীর্ণ হল। এমনি করে নিজের অভিশাপে নিজেই প্রাণ হারালেন তিনি।

কৃষ্ণ তখন সূর্যের উপর থেকে সুদর্শন-চক্র সরিয়ে আনলেন। অমনি অস্তোন্মুখ সূর্যালোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিমাকাশ। তখন সবাই বুঝলেন যে, কৃষ্ণের কৌশলেই আজ জয়দ্রথ নিহত হলেন। ভগিনীপতির শোকে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

সেদিন সন্ধ্যাগমেও যুদ্ধ থামল না—মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সংগ্রাম চলল। উভয় পক্ষ মশাল জ্বেলে রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

রাত্রিযুদ্ধ আরম্ভ হতেই ভীম বহ্লীকরাজকে বধ করলেন। তখন কর্ণ প্রচণ্ড তেজে পাণ্ডবসৈন্যকে আক্রমণ করলেন। পাণ্ডব-পক্ষের বহু যোদ্ধা কর্ণের শরাঘাতে প্রাণ হারাল—পাণ্ডব-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ার উপক্রম করল।

তখন কৃষ্ণের পরামর্শে ভীমপুত্র রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ কর্ণকে বাধা দিতে অগ্রসর হলেন। দুজনে প্রবল সংগ্রাম হতে লাগল—দুজনেই বিপক্ষের বহু বীরকে সংহার করলেন।

এই সময়ে অলায়ুধ নামে এক রাক্ষস এসে দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিল। অলায়ুধ ছিল হিড়িম্ব বক ও কির্মীরের বন্ধু। তাই

ভীমের উপর তার ছিল ভীষণ আক্রোশ। দুর্যোধনের অনুমতি পেয়ে ভীমকে আক্রমণ করার জন্য ধেয়ে গেল সে। কিন্তু ঘটোৎকচ শীঘ্রই তার মুণ্ড কেটে ফেললেন, তারপর সে মুণ্ড ছুড়ে দিলেন দুর্যোধনের দিকে। ভীমপুত্র ঘটোৎকচের ভীম পরাক্রম দেখে সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল কৌরবসৈন্য।

ঘটোৎকচের পরাক্রমে অস্থির হয়ে উঠল কৌরব-বাহিনী—জীবনের আশা ত্যাগ কবল তারা। কেবল কর্ণ অপবিসীম ধৈর্যে ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে কৌরবগণ কর্ণকে অনুরোধ করতে লাগলেন: তিনি অর্জুনকে বধ করার ইন্দ্রদত্ত যে একাঘ্নী অস্ত্রটি সযত্নে রক্ষা করছেন, সেটি নিক্ষেপ করে আজ বধ করুন এই দুর্দান্ত রাক্ষসরাজকে।

মহৎ কর্ণ—বীর কর্ণ! কৌরবদের অনুরোধ রক্ষা কবলেন তিনি। তাঁর চিরশত্রু অর্জুনকে বধ করাব এতদিন যে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্রটি সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন, আজ সেই একাঘ্নী অস্ত্রটি ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করে নিজেব জীবন বিপন্ন করে তুললেন।

কর্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়ে সেই ইন্দ্রদত্ত একাঘ্নী অস্ত্র মহাবেগে ছুটে এল ঘটোৎকচের দিকে। ঘটোৎকচ বুঝলেন: আর তাঁর রক্ষা নেই। তখন তিনি মায়াবলে স্বীয় দেহ ক্রমে ক্রমে স্ফীত করে পর্বতের ন্যায় বিশালকায় হয়ে উঠলেন। একাঘ্নী অস্ত্রটি ঘটোৎকচের বক্ষ ভেদ করে শূন্যে উঠে মিলিয়ে গেল। তাঁর বিগতপ্রাণ বিশাল দেহ কুরুবাহিনীর উপরে চেপে পড়ল; সেই চাপে প্রাণ হারাল সহস্র সহস্র কুরুসৈন্য।



দ্রোণের মৃত্যু

চতুর্দশ দিনের রাত্রিযুদ্ধে ঘটোৎকচ যখন নিহত হলেন, তখন মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। উভয় পক্ষের যোদ্ধারাই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও নিদ্রাতুর হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা সেই ধূলি ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন রণভূমিতেই শুয়ে নিদ্রা গেলেন সারা রাত।

পরদিন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবস। ঊষার আলোক আকাশে ফুটে ওঠার আগেই আবার আরম্ভ হল যুদ্ধ।

এদিন কালান্তক যমের ন্যায় যুদ্ধ করতে লাগলেন দ্রোণাচার্য। যুদ্ধ আরম্ভ হতে না হতেই তিনি দ্রুপদ ও বিরাটকে বধ করলেন। দ্রুপদের তিনটি নাতিও তাঁর হাতে প্রাণ হারালেন। পাণ্ডবগণ শোকার্ত হয়ে পড়লেন।

অতুলনীয় অস্ত্রশিক্ষা দ্রোণাচার্যের। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অস্ত্রপ্রহারে অস্থির করে তুললেন পাণ্ডব-বাহিনীকে। দলে দলে পাণ্ডবসৈন্য মারা পড়তে লাগল।

এ দেখে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের বললেন যে, দ্রোণ যদি এভাবে যুদ্ধ করতে থাকেন, তবে আরেক বেলার মধ্যেই বিনষ্ট হবে সমগ্র পাণ্ডব-বাহিনী, তাই অবিলম্বে তাঁকে বধ করা আবশ্যক; কিন্তু আচার্যের হাতে ধনুর্বাণ থাকলে দেবতারাও তাঁকে পরাস্ত করতে পারবেন না,—মানুষ ত দূরের কথা। দ্রোণকে বধ করতে হলে আগে নিরস্ত্র করতে হবে তাঁকে।

কিন্তু কি করে নিরস্ত্র করা যাবে দ্রোণাচার্যকে? কৃষ্ণ পরামর্শ দিলেন: এখন ধর্মাধর্ম ভুলে পাণ্ডবদের মধ্যে কেউ মিথ্যা করে দ্রোণকে বলুন যে, তাঁর বীর পুত্র অশ্বত্থামা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন; এ কথা শুনলে পুত্রবৎসল আচার্য শোকে কাতর হয়ে অস্ত্রত্যাগ করবেন; তখন সহজেই বধ করা যাবে তাঁকে।

এমন মিথ্যার এমন অধর্মের আশ্রয় নিতে সম্মত হলেন না অর্জুন। অন্য পাণ্ডবেরা অবশ্য সহজেই কৃষ্ণের প্রস্তাব মেনে নিলেন ; এমন কি, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পর্যন্ত প্রথমটা ইতস্ততঃ করে অবশেষে সায় দিলেন।

যে কোন প্রকারেই হোক, শত্রুবধে চিরকালই ভীমের পরমানন্দ। তাই কৃষ্ণের পরামর্শ কার্যে পরিণত করতে বিলম্ব করলেন না তিনি। মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার একটি হাতি ছিল ; সে হাতিটিরও নাম অশ্বত্থামা। ভীম তাঁর গদার আঘাতে বধ করলেন সে হাতিটিকে, তারপর দ্রোণের কাছে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন : "অশ্বত্থামা হত হয়েছেন।"

দ্রোণ জানতেন যে, তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা মহাবীর—তাঁকে বধ করা সহজ নয়। তাই তিনি ভীমের কথা বিশ্বাস না করে দ্বিগুণ তেজে আক্রমণ করলেন পাণ্ডব-বাহিনীকে। দেখতে দেখতে সাড়ে ছাব্বিশ হাজার পাণ্ডব-বীর, দশ হাজার হাতি এবং দশ হাজার ঘোড়া প্রাণ হারাল দ্রোণের বাণে।

ভীমের কথা বিশ্বাস না করলেও, তাতে কিছুটা উদ্বিগ্ন বোধ করেছিলেন দ্রোণ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, স্বর্গ মর্ত্য পাতালের সমস্ত ঐশ্বর্য পেলেও যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা বলবেন না। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের দেখা পেলে তাঁকে দ্রোণ জিজ্ঞাসা করলেন : অশ্বত্থামা সত্যই নিহত হয়েছেন কিনা ?

কিন্তু কৃষ্ণের পরামর্শে চিরসত্যবাদী যুধিষ্ঠিরও আজ অর্ধসত্য বললেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন : "অশ্বত্থামা হতঃ" অর্থাৎ অশ্বত্থামা নিহত হয়েছেন, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন : "ইতি কুঞ্জরঃ" অর্থাৎ এই নামের হস্তী।

সত্যবাদী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রথ এতদিন মাটি থেকে চার আঙ্গুল

উপরে থাকত, এখন এই মিথ্যা বলার পাপে তাঁর রথখানি মাটির উপরে নেমে পড়ল।

যুধিষ্ঠিরের কথায় দ্রোণের পূর্ণ বিশ্বাস হল যে, অশ্বত্থামা আর জীবিত নেই। তাঁর হৃদয় ভেঙে গেল। শরাসন ত্যাগ করে রথের উপবে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসলেন তিনি। এই সুযোগে ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ হাতে নিয়ে রথ থেকে ভূমিতে লাফিয়ে পড়ে ছুটে গেলেন দ্রোণের দিকে। তা দেখে উভয় পক্ষেরই যোদ্ধারা হাহাকার করে উঠলেন।

যোগমগ্ন দ্রোণ চোখ বুজে পরমপুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করতে লাগলেন। সহসা তাঁর দেহ থেকে এক দিব্য জ্যোতি নির্গত হল, সেই জ্যোতি উল্কার মত বেগে শূন্যে উঠে মিলিয়ে গেল! এ ব্যাপার কেবল পাঁচজনেরই দৃষ্টিগোচর হল; সে পাঁচজন হলেন: কৃষ্ণ, কৃপ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও সঞ্জয়।

এমনি ভাবে দেহত্যাগ করলেন দ্রোণ। কিন্তু ঐ পাঁচজন ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারলেন না যে, তাঁর মৃত্যু ঘটেছে, কারণ তাঁর প্রাণহীন দেহ তখনও উপবিষ্ট অবস্থাতেই রথের উপরে ছিল। এমন সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়ে দ্রোণের শিরশ্ছেদ করলেন।

এ দেখে উভয় পক্ষের বীরেরাই ধিক্কার দিতে লাগলেন ধৃষ্টদ্যুম্নকে।

পিতার মৃত্যুতে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তিনি স্থির করলেন যে, আজই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য সংহার করবেন। অশ্বত্থামার একটি ভীষণ অস্ত্র ছিল। সেটির নাম: নারায়ণাস্ত্র। এ অস্ত্র নিক্ষেপ করলে, তা প্রতিপক্ষের সমস্ত অস্ত্রধারীকে বধ করবেই। এ অস্ত্র থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায় হল অস্ত্র ত্যাগ করে রথ বা বাহন থেকে নেমে পড়া।

পাণ্ডবসৈন্য সংহারের জন্য ঐ করাল অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন অশ্বত্থামা। মৃত্যুর দূতের মত অস্ত্রটি পাণ্ডবদের লক্ষ্য করে মহাবেগে ছুটে আসতে লাগল।

নারায়ণাস্ত্রের রহস্য অগোচর ছিল না কৃষ্ণের। তিনি সমস্ত পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাদের সতর্ক করে দিয়ে নিরস্ত্র হয়ে রথ ও বাহন থেকে নেমে পড়তে বললেন। পাণ্ডবসৈন্য তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের কথামত কাজ করলেন। কেবল বীরবর ভীম উচ্চৈঃস্বরে বললেন : "একি কথা, কৃষ্ণ, প্রাণভয়ে রণক্ষেত্রে অস্ত্রত্যাগ করবে ক্ষত্রিয় বীর! না-না, অস্ত্রত্যাগ করো না তোমরা কেউ। আমি অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করছি।"

কিন্তু প্রাণভয়ে ভীত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদের কেউ অস্ত্রগ্রহণে সাহসী হলেন না। তখন অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্র কেবল ভীমসেনের দিকেই ছুটে আসতে লাগল। এ দেখে কৃষ্ণ ও অর্জুন শঙ্কিত হয়ে রথ থেকে নেমে দ্রুতপদে ভীমের কাছে গেলেন। তাঁরা ভীমকে সবলে জড়িয়ে ধরে তাঁর অস্ত্র কেড়ে নিলেন। ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে আরক্ত নয়নে সাপের মত ফোঁসফোঁস করতে লাগলেন।

যাহোক, নারায়ণাস্ত্র কোন অস্ত্রধারীকে না পেয়ে নিবৃত্ত হল। দুর্যোধন পুনর্বার নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে অনুরোধ করলেন অশ্বত্থামাকে। কিন্তু অশ্বত্থামা বললেন : নারায়ণাস্ত্র একবারের বেশী প্রয়োগ করা চলে না,—করলে তা প্রয়োগকারীকেই বধ করে।

কর্ণপর্ব

দুঃশাসন-বধ

ভীষ্ম গেলেন, দ্রোণ গেলেন, এবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ষোড়শ দিনে কৌরবপক্ষের সেনাপতি হলেন কর্ণ।

এদিনের যুদ্ধ আরম্ভ হতে অশ্বত্থামার সঙ্গে ভীমের প্রচণ্ড সংগ্রাম হতে লাগল। অশ্বত্থামার অস্ত্রশিক্ষা ও ভীমের শারীরিক শক্তি দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে 'ধন্য ধন্য' করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত উভয়ে উভয়ের শরাঘাতে অচেতন হয়ে পড়লেন। তাঁদের সারথিরা রথ সরিয়ে নিয়ে গেল।

চেতনা ফিরে পেয়ে আবার রণক্ষেত্রে এলেন অশ্বত্থামা। এবার তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ হতে লাগল অর্জুনের। ঘোর যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে অশ্বত্থামা রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার যুদ্ধ করতে এলেন অশ্বত্থামা। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীর পাণ্ড্যরাজ সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বধ করছিলেন কৌরবসৈন্য। অশ্বত্থামা তাঁকে বধ করলেন।

এই সময়ে নকুল মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করে প্রচুর কৌরবসৈন্য বধ করছিলেন। কর্ণ তাঁকে বাধা দেবার জন্য অগ্রসর হলেন। কর্ণকে দেখে নকুল বললেন: "পাপী, তুমিই সমস্ত অনর্থ শত্রুতা ও কলহের মূল। আজ তোমাকে সমরে বধ করব আমি।"

কর্ণ বললেন: "ওহে বীর, আগে তোমার পৌরুষ দেখাও, গর্ব করো পরে।"

এই বলে নকুলকে আক্রমণ করলেন কর্ণ। শীঘ্রই তিনি

নকুলকে নিরস্ত্র ও পরাস্ত করলেন। নকুল রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে নিজের প্রাণরক্ষা করলেন।

এর পর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধে বারংবার পরাজিত হলেন স্বয়ং কুরুরাজ দুর্যোধন। তখন অর্জুনের শরাঘাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল কৌরবসৈন্য। এ.ন সময়ে সূর্যাস্ত হল : সমাপ্ত হল সেদিনের মত সর্বনাশা যুদ্ধ।

সমরে পরাজিত হয়ে ম্লানমুখে শিবিরে ফিরে গেলেন কৌরবেরা।

পরদিন প্রভাতে দুর্যোধনকে বললেন সেনাপতি কর্ণ : "মহারাজ, আমাদের পক্ষের প্রধান বীরেরা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, ইন্দ্রের দেওয়া একাঘ্নী অস্ত্র আমার আর নেই, তবু শৌর্যে বীর্যে জ্ঞানে অস্ত্রশিক্ষায় অর্জুন আমার সমকক্ষ নন। তাঁর গাণ্ডীব ধনুঃ উৎকৃষ্ট বটে ; কিন্তু আমি আমার গুরু পরশুরামের কাছ থেকে 'বিজয়' নামে যে ধনুঃ পেয়েছি, তার কাছে গাণ্ডীব তুচ্ছ। তবে এক বিষয়ে আমি তাঁর চেয়ে হীন।"

দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করলেন : "কোন্ বিষয়ে ?"

"সারথি" উত্তর দিলেন কর্ণ, "একেই ত অর্জুনের ধনুঃতে দিব্য জা আছে, তাঁর দুটি অক্ষয় তূণীব আছে, আছে দিব্যরথ আর সে রথে বাতাসের মত দ্রুতগামী সব ঘোড়া এবং সে রথচূড়ায় বসে সিংহনাদ করছে ভয়ঙ্কর এক বানর ; এর উপর তাঁর সারথি হলেন স্বয়ং মহাপুরুষ কৃষ্ণ। আমিও যদি কৃষ্ণের তুল্য সারথি পাই, তবে সহজেই জয় করতে পারব অর্জুনকে।"

"তাহলে উপায় ?" প্রশ্ন করলেন দুর্যোধন।

কর্ণ বললেন : "মদ্ররাজ শল্য আছেন আমাদের পক্ষে।

শক্তিতে ও বীরত্বে তিনি কৃষ্ণেরই সমান। তিনি যদি আমার সারথি হন, তবে আমি অবলীলাক্রমেই জয় করতে পারব অর্জুনকে।"

দুর্যোধন বললেনঃ "ঠিক আছে, কর্ণ, আমি যেমন করে পারি, মদ্ররাজ শল্যকে তোমার সারথি হতে রাজী করাব।"

দুর্যোধনের অনুরোধে কর্ণের সারথি হতে সম্মত হলেন শল্য। তবে তিনি শর্ত করে নিলেন যে, সারথি হয়ে তিনি কর্ণকে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারবেন।

কর্ণ এ শর্ত মেনে নিলেন।

আরম্ভ হল সপ্তদশ দিনের যুদ্ধ।

কর্ণের তেজোহানি করার জন্য যুধিষ্ঠিরের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শল্য, তা রক্ষা করার জন্যই তিনি কর্ণকে শর্তাবদ্ধ করিয়ে নিয়েছিলেন। এখন তাই, যুদ্ধযাত্রা করে কর্ণ যতই নিজের বীরত্ব সম্বন্ধে গর্ব করতে লাগলেন, শল্য ততই তাঁকে অর্জুনের চেয়ে হীন বলে বর্ণনা করে তাঁর মনোবল ভেঙে দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত কলহ বেধে গেল কর্ণে ও শল্যে—রথীতে ও সারথিতে। দুর্যোধন এসে কোন রকমে তখনকার মত শান্ত করলেন তাঁদের।

এদিন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত রইলেন অর্জুন। কর্ণ এই অবসরে প্রচণ্ড তেজে পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। একমাত্র ভীম ছাড়া তাঁর সামনে দাঁড়াতেই পারলেন না কেউ। অর্জুন সংশপ্তকদের বধ করে এসে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অর্জুনের বিক্রমে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কুরুসৈন্য। তখন দুর্যোধনের দশ ভাই এলেন তাঁকে বাধা দিতে, কিন্তু অর্জুন শীঘ্রই তাঁদের শিরশ্ছেদ করে ফেললেন।

এদিকে ভীমও মহা বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁকে রোধ করতে এলেন দুঃশাসন। অল্পকালমধ্যেই ভীমের বাণে দুঃশাসনের ধনুঃ ও ধ্বজ কাটা গেল এবং তাঁর সারথি মারা পড়ল। কিন্তু দুঃশাসনও ক্ষুদ্র বীর নন। তিনি নিজেই রথ চালাতে লাগলেন এবং নতুন ধনুঃ নিয়ে ভীমের প্রতি তীর নিক্ষেপ করলেন। সে শরপ্রহারে ভীম অচেতন হয়ে রথের মধ্যে শুয়ে পড়লেন। ভীম বোধ হয় প্রাণ হারালেন ভেবে আর্তনাদ করে উঠলেন পাণ্ডবেরা।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞালাভ করে উঠে দাঁড়ালেন ভীম। গর্জন করে দুঃশাসনকে বললেন তিনি: "দুরাত্মা, আজ তোর রক্তপান করব আমি।"

এই বলে ভীম তাঁর ভীষণ গদাটি দুঃশাসনের মাথায় ছুড়ে মারলেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে চল্লিশ হাত দূরে ছিটকে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন দুঃশাসন।

ভীম অসিহস্তে লাফিয়ে নামলেন তাঁর রথ থেকে। তারপর ছুটে দুঃশাসনের কাছে গিয়ে পা দিয়ে তাঁর গলা চেপে ধরে সগর্জনে বললেন: "কুলবধূ দ্রৌপদীর অপমান করেছিল এই কুলাঙ্গার। আজ আমি এর রক্তপান করব। পার ত কেউ রক্ষা কর একে।"

এই বলে ভীম তাঁর অসি দিয়ে দুঃশাসনের বুক চিরে গরম গরম রক্ত পান করলেন। তারপর তিনি দুঃশাসনের শিরশ্ছেদ করে রক্ত চাখতে চাখতে বলতে লাগলেন: "মায়ের দুধ, মধু, ঘি এবং আরও যত রকম মধুর পানীয় আছে ভূমণ্ডলে, সে সমস্তের চেয়ে ঢের বেশী সুস্বাদু এই শত্রুর রক্ত!"

ভীমের কাণ্ড দেখে কৌরবসৈন্য ভয়ে কম্পিতকলেবর হল। "ভীমসেন মানুষ নয়—রাক্ষস"—এই বলতে বলতে তারা পালাতে লাগল।

কর্ণবধ

দুঃশাসনকে বধ করে ভীম হয়ে উঠলেন দুর্মদ। দুর্যোধনের আরও দশটি ভাইকে সংহার করলেন তিনি। তা দেখে কর্ণপুত্র বৃষসেন মহাবিক্রমে আক্রমণ করলেন পাণ্ডবদের। বহুক্ষণ ধরে যুদ্ধ করার পর অর্জুনের বাণে প্রাণ হারালেন তিনি।

পুত্রশোকে অস্থির হয়ে উঠলেন কর্ণ। ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে তিনি আক্রমণ করলেন অর্জুনকে। দুই বীরশ্রেষ্ঠে আরম্ভ হল ঘোর সমর।

অর্জুনের রথধ্বজে বিবাট্‌কায় হনূমান, কর্ণের রথধ্বজে হাতি-বাঁধা দড়ি; হনূমান লাফ দিয়ে পড়ে আক্রমণ করল কর্ণের রথধ্বজ। অর্জুনের সারথি পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ, আব কর্ণের সারথি বীরশ্রেষ্ঠ শল্য; এঁরা দুজনে পরস্পরের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন—বুঝি ভস্ম করে দেবেন একজন আরেকজনকে!

পরস্পরকে অস্ত্র হানতে আরম্ভ করলেন অর্জুন আব কর্ণ। বিষম বিষম সব অস্ত্র—সবাই আতঙ্কিত হল: বুঝি প্রলয় হবে।

ব্যাপাব দেখে উৎকণ্ঠিত হলেন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা। সৈন্যদের প্রাণবক্ষার জন্য দুর্যোধনের হাত দুটি ধবে ব্যাকুল কণ্ঠে মিনতি করে বললেন তিনি: "দুর্যোধন—দুর্যোধন, বন্ধ কর এ সর্বনাশা যুদ্ধ, নইলে জীববর্গ ধ্বংস হবে। আমি পাণ্ডবদের বলি, তাঁরা নিশ্চয়ই আমার কথা রাখবেন—আর যুদ্ধ করবেন না। তুমি সন্ধি কর তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা চিরকাল তোমার অনুগত থাকবেন।"

কর্ণার্জুনের প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ দেখে দুর্যোধনও শঙ্কিত হয়েছিলেন, তবু সন্ধি করতে তাঁর মন সরল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিষণ্ণকণ্ঠে তিনি বললেন: "বন্ধু, যা বলছ, তা ঠিক বটে। কিন্তু, অনেক দূর এগিয়ে পড়েছি আমি, ফেরার পথও বন্ধ করে দিয়েছি নিজের হাতে,—এখন আর ফেরা চলে না। বন্ধু, হলাহল-বিষ যে পান

করেছে, হয় তাকে মরতে হবে, নয়ত হজম করতে হবে সে বিষ। তাছাড়া, দুঃশাসনের মৃত্যুতে যে আগুন জ্বলেছে আমার অন্তরে, তা ত সন্ধি করলে নিভবে না। না-না, বন্ধু, সন্ধি অসম্ভব।”

সুতরাং যুদ্ধ চলল—যুদ্ধ চলল কর্ণার্জুনেব—মহাভারতের দুই মহারথের। কর্ণের বাণে পাণ্ডবপক্ষের বহু বীর নিহত হলেন, স্বয়ং অর্জুনের দেহেও সুতীক্ষ্ণ দশ বাণ বিদ্ধ হল।

এ দেখে অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন ভীম। অর্জুনকে ডেকে তিনি বললেন: “একি, অর্জুন! তোমার সামনেই আমাদের পক্ষের এতগুলি বীরের প্রাণহানি ঘটাল পাপিষ্ঠ সূতপুত্র কর্ণ! তুমি নিজেও শরাহত হলে! তুমি কি তোমার ত্রিভুবনজয়ী অস্ত্রকৌশল ভুলে গেলে? বল, তুমি যদি আজ কর্ণকে বধ না করতে পার, তবে আমিই গদাঘাতে ওর মস্তক চূর্ণ করি।”

কৃষ্ণও কর্ণকে বধ করার জন্য অর্জুনকে উত্তেজিত করলেন।

ভীমের তিরস্কারে আর কৃষ্ণের উত্তেজনায় প্রচণ্ড হয়ে উঠলেন অর্জুন। উন্মত্তের মত গাণ্ডীব-ধনুঃ ঘন ঘন আকর্ষণ করে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন তিনি। অত্যধিক টান পড়ায় একসময়ে গাণ্ডীবের গুণ ছিন্ন হল। অর্জুন ধনুঃতে নতুন গুণ পরাতে লাগলেন।

এই অবসরে কর্ণ একশ বাণ ছুড়ে ছেয়ে ফেললেন অর্জুনকে, কৃষ্ণকেও বিঁধলেন ষাট বাণে। কৌরবেরা ভাবলেন: কৃষ্ণার্জুন পরাজিত হয়েছেন। তাই হাততালি দিয়ে সিংহনাদ করতে লাগলেন তাঁরা।

পরক্ষণেই গাণ্ডীবে নতুন গুণ পরিয়ে প্রচণ্ডভাবে বাণ ছুড়তে লাগলেন অর্জুন। দলে দলে কৌরবসৈন্য মারা পড়তে লাগল তাঁর বাণে। শেষ পর্যন্ত প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তারা কর্ণ ও শল্যকে ফেলে রণক্ষেত্র থেকে পালাতে লাগল।

এমন সময়ে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটল। খাণ্ডবদহনের সময়ে তক্ষকনাগের ছেলে অশ্বসেন কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল, কিন্তু তার মা পুড়ে মরেছিলেন। তাই তার মাতৃহন্তা অর্জুনের উপর বিষম আক্রোশ ছিল অশ্বসেনের।

এখন বাণের আকার ধারণ করে অশ্বসেন এসে প্রবেশ করল কর্ণের তূণে। কর্ণও নিজের অজানতে সেই বাণ নিক্ষেপ করলেন অর্জুনের প্রতি। কেউ জানতে পারলেন না বাণের প্রকৃত তত্ত্ব—জানলেন কেবল সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ।

ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল দীপ্তি বিকীর্ণ করতে করতে অর্জুনের দিকে ধেয়ে এল বাণরূপী অশ্বসেন। মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য মৃত্যুর মতই অনিবার্য হয়ে উঠেছে সে! কৃষ্ণ দেখলেন: ভীষণ বিপদ্। অর্জুনের প্রাণরক্ষার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি। তিনি পায়ের চাপে রথখানি মাটির মধ্যে হাতখানেক বসিয়ে দিলেন। ফলে, বাণরূপী অশ্বসেন অর্জুনেব দেহেব নাগাল পেল না, কেবল তার জগদ্বিখ্যাত স্বর্ণকিরীটটিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

এইভাবে কৃষ্ণের কৌশলে ব্যর্থ হয়ে অশ্বসেন ফিরে গেল কর্ণের কাছে। তাঁকে সে অনুরোধ করল: আবার তিনি অশ্বসেনকে নিক্ষেপ করুন অর্জুনের প্রতি।

কিন্তু বীর কর্ণ, আত্মবিশ্বাসী কর্ণ সম্মত হলেন না এ প্রস্তাবে, বললেন: "অশ্বসেন, আমি তোমাকে চিনতে পারিনি, তাই তোমাকে নিক্ষেপ করেছিলাম অর্জুনের প্রতি। কিন্তু বৈরীদমনের জন্য নিজের বাহুবলের উপরই আস্থা রাখব আমি—এর জন্য পরের সাহায্য নেব না। অশ্বসেন, আমি ক্ষত্রিয় যোদ্ধা—পুরুষকারেই আমি বিশ্বাসী, দৈবকে স্বীকার করি না।"

কর্ণের বীরদর্পপূর্ণ প্রত্যাখ্যানে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হল অশ্বসেন, কিন্তু

অর্জুনের উপর প্রতিহিংসা-গ্রহণের চেষ্টা ত্যাগ করল না। সে নিজেই ছুটে গেল অর্জুনকে আক্রমণ করতে। অর্জুন তখন ছয় বাণ ছুড়ে তাকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেললেন।

এরপর আবাব কর্ণার্জুন পরস্পরেব প্রতি ভীষণ ভীষণ শববর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁদেব বাণে বাণে আকাশ ছেয়ে গেল, সূর্যেব আলো ঢেকে গেল, জীবজন্তু ভয়ে আর্তনাদ কবতে লাগল; মনে হল যেন প্রলয়ের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে পৃথিবী ব্যেপে! উভয় পক্ষেরই যোদ্ধারা মুগ্ধনেত্রে চিবপ্রতিদ্বন্দ্বী বীরদ্বয়েব সমর দেখতে লাগলেন। ধন্য শিক্ষা দুজনের—ধন্য বীরত্ব!

বহুক্ষণ এইভাবে যুদ্ধ চলল। কে যে জিতবে আর কে হারবে, সে সম্বন্ধে কোন ধাবণাই করতে পারলেন না কেউ। শেষে অর্জুনের বাণে কর্ণেব স্বর্ণকিবীট কুণ্ডল ও বর্ম ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, তাঁর শরীবের নানা স্থানও বিদীর্ণ হল।

বিপদের পর বিপদ্! সহসা কর্ণের বথের চাকা বসে গেল মাটির মধ্যে। রথ নড়ে না চড়ে না,—ভাল করে তীর ছুড়তে পারেন না কর্ণ। এই বিষম বিপাকে পড়ে তিনি অর্জুনকে অনুরোধ করলেন: "হে অর্জুন, দেখ, আমাব রথচক্র মাটির মধ্যে বসে গেছে। ক্ষত্রিয় তুমি, ধার্মিক তুমি,—ক্ষত্রিয়ের মত আচবণ কর, অধর্ম করো না। আমার এই দৈবদুর্বিপাকেব সুযোগ নিয়ো না কাপুরুষের মত। ক্ষণকাল তুমি আক্রমণ বন্ধ রাখ,—আমাকে রথচক্র তুলে নেবার অবসর দাও।"

এ কথার উত্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বললেন: "হে কর্ণ, এখন বিপদে পড়ে ধর্মের কথা বলছ তুমি। কিন্তু দুর্যোধন দুঃশাসন আর শকুনির সঙ্গে মিলে কুরুসভামধ্যে দ্রৌপদীকে অপমান করেছিলে তুমি, তখন ত তোমার ধর্মের কথা মনে পড়েনি!

শকুনি যখন চোরা পাশাখেলায় সর্বস্বহারা করেছিল পাণ্ডবদের, তখন ত ধর্মের কথা স্মরণ হয়নি তোমার! যখন তোমরা ছয় মহারথ একত্রে মিলে অন্যায় যুদ্ধে বধ করেছিলে কিশোর অভিমন্যুকে, তখন কোথায় ছিল তোমার ধর্মজ্ঞান? এখন মরণ আসন্ন দেখে বুঝি ধর্মকে মনে পড়েছে তোমার?"

কৃষ্ণের কথা শুনে কর্ণ যুগপৎ লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগল, চোখ জ্বলতে লাগল। অর্জুনের প্রতি তিনি এক ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করলেন। সে বাণ গিয়ে বিঁধল অর্জুনের কনুইতে। অর্জুনের মাথা ঘুরতে লাগল, দেহ কাঁপতে লাগল, গাণ্ডীব-ধনুঃ খসে পড়ে গেল তাঁর হাত থেকে। এই অবসরে কর্ণ রথ থেকে নেমে দু হাত দিয়ে রথের চাকা টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা—কিছুতেই আর রথচক্র উঠল না।

এদিকে অর্জুন সুস্থির হয়ে উঠে তীক্ষ্ণ এক বাণ ছুড়ে ছেদন করলেন কর্ণের রথধ্বজ। তারপর তিনি ভয়ঙ্কর এক শর নিক্ষেপ করে শিরশ্ছেদ করলেন সূতপুত্রের। অস্তাচলগামী সূর্যের মত কর্ণের রক্তাক্ত শির লুটিয়ে পড়ল ভূমিতে।

কাল মৃত্যু গ্রাস করল বীর কর্ণকে, সন্ধ্যার অন্ধকার গ্রাস করল পৃথিবীকে, আর বিষাদের কালিমা গ্রাস করল কৌরবপক্ষকে!

সেদিন শিবিরে ফিরে যুধিষ্ঠির সহর্ষে বললেন কৃষ্ণকে: "কৃষ্ণ, কর্ণের ভয়ে গত তের বছর আমি ভাল করে ঘুমতে পারিনি। তোমার প্রসাদে আজ সুখে নিদ্রা যাব আমি!"

শল্যপর্ব

শল্যবধ

কর্ণের মৃত্যুর পরে কৌবরপক্ষে মহারথ কেউ আর রইলেন না বড়। দুর্যোধনও সখা কর্ণেব মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়লেন। গুরু কৃপাচার্য তাঁকে যথোচিত সান্ত্বনা দিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন ঃ এখন সন্ধি করাই উচিত কারণ দুর্যোধন পাণ্ডবদের চেয়ে হীনবল হয়ে পড়েছেন। তিনি আরও বললেন ঃ যুধিষ্ঠির দয়ালু,—এখনও সন্ধি করলে নিশ্চয়ই তিনি রাজপদ দেবেন দুর্যোধনকে।

কৃপের কথা শুনে দুর্যোধন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন ঃ "সুহৃদের মতই উপদেশ দিলেন আপনি। কিন্তু, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, মুমূর্ষুব যেমন ঔষধে রুচি হয় না, আমারও তেমনি আপনার সদুপদেশ মনে ধরছে না। পাণ্ডবদের প্রতি আমি যে অন্যায় করেছি, তা তাঁরা কখনই বিস্মৃত হবেন না। হে গুরু, হে বন্ধু, যে আগুন আমি জ্বেলেছি নিজের হাতে, তাতে আমাকে পুড়ে মরতে হবেই—যে মানুষ নিজের হাতে তাব ঘর ভেঙেছে, সে আর কোথায় রাত কাটাবে গাছতলা ছাড়া ?"

অতএব এখনও থামল না কুলক্ষয়কারী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এবার কৌরবপক্ষে সেনাপতি হলেন মদ্ররাজ শল্য।

পাণ্ডব-শিবিরে যখন এ সংবাদ পৌছল, তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন কৃষ্ণসারথি। যুধিষ্ঠিরকে তিনি বললেন ঃ "ধর্মরাজ, শল্য বোধ হয় ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের চেয়েও বড় বীর। তিনি

ভীমার্জুনের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী। একমাত্র আপনি ছাড়া এ পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে শল্যকে বধ করতে পারে। সুতরাং, মাতুল ভেবে তাঁকে ক্ষমা না করে, ক্ষত্রোচিত যুদ্ধ করে বধ করুন আপনি শল্যকে।”

কৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠির শল্যের সঙ্গে যুদ্ধ কবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

পবদিন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আঠার দিনের দিন আবার আরম্ভ হল যুদ্ধ।

. আরম্ভ হল শল্যে আর যুধিষ্ঠিরে যুদ্ধ—মাতুলে আর ভাগিনেয়ে প্রাণঘাতী সংগ্রাম। দুজনে দুজনকে সাজ্ঘাতিক সর্ব শর নিক্ষেপ করে আঘাত করতে লাগলেন।

কিন্তু সবাই বিস্মিত হল যুধিষ্ঠিরকে এমন তেজে যুদ্ধ করতে দেখে। তাঁর মত শান্তপ্রকৃতি ও ধীরস্বভাব ব্যক্তিও যে এমন প্রচণ্ড হতে পারেন, কে ভেবেছিল সে কথা? শত শত কৌববসৈন্য বধ করলেন যুধিষ্ঠির। শল্যের রথাশ্ব এবং সারথিকেও বধ করলেন তিনি। শল্যকে বিপন্ন দেখে ছুটে এলেন অশ্বত্থামা; তিনি তাঁকে নিজের রথে তুলে নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে নতুন রথে চড়ে আবার যুদ্ধ কবতে এলেন শল্য। এবারে তিনি ভীষণ। মুহূর্তমধ্যে তিনি যুধিষ্ঠিবের ঘোড়াগুলিকে নিহত করলেন। তা দেখে ভীম তাড়াতাড়ি শল্যের রথাশ্ব ও সারথিকে সংহার করলেন। শল্য তখন রথ থেকে নেমে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবিত হলেন। শল্যের খড়্গ এবং বর্মকে ছেদন করলেন ভীম। এমনিভাবে শল্য নিরস্ত্র হয়ে পড়লে, তাঁর প্রতি দারুণ এক অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন যুধিষ্ঠির। সেই অস্ত্র উল্কাবেগে গিয়ে

করতে। ভীমসেনকে নিত্য মাংস জোগাত তারা। দুর্যোধনাদির আলাপ-আলোচনা শুনতে পেয়ে তারা ভীমকে গিয়ে সব কথা জানাল।

এইভাবে দুর্যোধনের সংবাদ পেয়ে পাণ্ডবেরা সদলবলে দ্বৈপায়ন-হ্রদের তীরে গেলেন। তাঁদের সাড়া পেয়ে কৃপ অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা আড়ালে সরে গিয়ে একটি বটগাছের নিচে বসে ভাবতে লাগলেন দুর্যোধনের ভাগ্যের কথা। কি শোচনীয় অধঃপতন! মহারাজ-চক্রবর্তী দুর্যোধন আজ ভীরু কাপুরুষের মত আশ্রয় নিয়েছেন দ্বৈপায়ন-হ্রদের মধ্যে—সঙ্গীহীন, শক্তিহীন! এ যেন আকাশের সূর্য খসে এসে পড়েছে সঙ্কীর্ণ এক গুহার মধ্যে!

যুধিষ্ঠির ধিক্কার দিয়ে বললেন দুর্যোধনকে: "দুর্যোধন, একি! কোথায় গেল তোমার দর্প আর মান? আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে যুদ্ধে বলি দিয়ে শেষে নিজে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলে ভীরুর মত! তুমি না চিরদিন বীর বলে অহঙ্কার করতে? কোথায় গেল তোমার সে দম্ভ। বীর নও তুমি মোটেই—কাপুরুষ, কাপুরুষ! ক্ষত্রিয়কুল-কলঙ্ক, উঠে এস—যুদ্ধ কর: হয় আমাদের পরাস্ত করে পৃথিবীর অধীশ্বর হও, নয়ত যুদ্ধে নিহত হয়ে স্বর্গে যাও।"

দুর্যোধন বললেন: "মহারাজ, এখনও আমি আপনাকে পরাস্ত করে সমগ্র কুরুরাজ্য দখল করতে পারি। কিন্তু আমার শত ভ্রাতা, পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণ, বন্ধু কর্ণ, প্রভৃতি আমার পক্ষের সমস্ত বীরই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। এতে আমার মন ভেঙে গেছে—রাজ্যভোগের বাসনা নেই আর। এখন আমি মৃগচর্ম পরে বনে যেতে চাই। আপনি ভোগ করুন রাজ্য।"

যুধিষ্ঠির কঠিন কণ্ঠে তাঁকে বললেন: "পাপিষ্ঠ দুর্যোধন, এখন আর তোমার দয়ার প্রত্যাশী নই আমরা। যুদ্ধে ত আমাদের

জয় হয়েই গেছে, এখন তোমাকে বধ করব আমরা। উঠে এস, যুদ্ধ কর।"

আর কখনও এমন তিরস্কার শোনেননি মহারাজচক্রবর্তী দুর্যোধন। খাঁচায় বন্দী অজগরের মত ফোঁস্‌ফোঁস্‌ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন তিনিঃ "রাজন্‌, আপনার বন্ধুবান্ধব সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র যানবাহন সমস্তই আছে। কিন্তু আমার কেবল এই গদা সম্বল। সুতরাং, আমি আপনাদের মিলিত শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি না—আপনারা একে একে যুদ্ধ করুন আমার সঙ্গে।"

যুধিষ্ঠির বললেনঃ "তাই হবে, দুর্যোধন। তুমি তোমার মনোমত অস্ত্র নিয়ে আমাদের মধ্যে যে কোন একজনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তাঁকে যদি তুমি বধ করতে পার, তাহলেই তুমি কুরুরাজ্য পাবে—আর কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে না তোমার।"

দুর্যোধন বললেনঃ "আমি এই গদা নিলাম, এখন আপনার পক্ষের যে কোন একজন গদাযুদ্ধ করুন আমার সঙ্গে।"

যুধিষ্ঠির বললেনঃ "তুমিই আমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যে কোনজনকে তোমার প্রতিযোদ্ধারূপে বেছে নাও।"

দুর্যোধন তখন তাঁর চিরশত্রু ভীমকে বেছে নিলেন।

এ ব্যাপার দেখে কৃষ্ণ অত্যন্ত রেগে গেলেন। যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করে বললেন তিনিঃ "একি করলেন, মহারাজ! ভীম দুর্যোধনের চেয়ে অধিকতর বলবান্‌ ও সহিষ্ণু বটে, কিন্তু দুর্যোধন অধিকতর কৌশলী। শক্তির চেয়ে কৌশলেরই মূল্য বেশী। তাছাড়া, ভীমকে বধ করার সঙ্কল্প নিয়ে তের বছর ধরে নিয়মিত ভাবে তাঁর একটি লৌহমূর্তির উপরে গদাপ্রহার অভ্যাস করেছেন দুর্যোধন। মহারাজ, আপনি শত্রুকে সুবিধা দিয়ে বিপদ্‌ ডেকে এনেছেন আমাদের। আপনার ভুলেই আমরা বিপদে পড়েছি

বারংবার। আপনিই ভুল করে রাজী হয়েছিলেন শকুনির সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া করতে। তার ফলেই না এত কষ্টভোগ করতে হল আমাদের ?”

ভীম বললেন ঃ “কৃষ্ণ, ক্ষুব্ধ হয়ো না তুমি। আজ আমি নিশ্চয়ই দুর্যোধনকে বধ করব। আমার গদা দুর্যোধনের চেয়ে দেড় গুণ ভারী। এর আঘাত কখনই সহ্য করতে পারবে না সে পাপিষ্ঠ।”

শ্রীকৃষ্ণ পরম সন্তুষ্ট হয়ে বললেন ঃ “তাই হোক, ভীমসেন, তাই হোক। আপনি আজ দুর্যোধনকে বধ করে সসাগরা পৃথিবীব অধীশ্বর করুন যুধিষ্ঠিরকে।”

ভীম তখন গদাযুদ্ধে আহ্বান করলেন দুর্যোধনকে। দুর্যোধনও খেপা হাতির মত এগিয়ে এলেন। ভীম গর্জন করে তাঁকে বললেন ঃ “কুলঘ্ন, তোমার জন্যই আজ কুরুবংশ ধ্বংসপ্রায়। এর প্রতিফল আজ দেব তোমাকে—গদাব আঘাতে তোমাকে সংহার করব।”

দুর্যোধন বললেন ঃ “মিথ্যা দম্ভ কবো না, ভীম। ন্যায়যুদ্ধে কে হারাবে আমাকে ? স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও পারবেন না। এস, শরতের মেঘের মত অসার গর্জন না করে যুদ্ধ কর।”

এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর বলরাম নানা তীর্থ পর্যটন করে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন হলায়ুধ অর্থাৎ লাঙল নিয়ে যুদ্ধ করতেন তিনি। গদাযুদ্ধেও তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। ভীম ও দুর্যোধন দুজনেই ছিলেন তাঁর প্রিয়শিষ্য। তবে ভীমের চেয়ে দুর্যোধনকেই বেশী স্নেহ করতেন বলরাম, কারণ দুর্যোধন ছিলেন অধিকতর মনোযোগী ও কুশলী। বলরাম বললেন যে, তিনি তাঁর প্রিয়শিষ্যদ্বয়ের গদাযুদ্ধ দেখবেন।

তখন সকলে দ্বৈপায়ন-হ্রদের তীর ত্যাগ করে আবার ফিরে গেলেন কুরুক্ষেত্রে। কুরুক্ষেত্রের একাংশের নাম সমন্তপঞ্চক। সেই সমন্তপঞ্চকে আরম্ভ হল গদাযুদ্ধ।

দুই মহাবীর গদা হাতে নিয়ে দুই বন্য বৃষের মত গর্জন করতে করতে আক্রমণ করলেন পরস্পরকে। কি বিচিত্র শিক্ষা তাঁদের! দুজনেই সমান বীর, সমান কুশলী! কে জেতে, কে হারে,—বলা কঠিন হল।

অনেকক্ষণ পরে ভীমের গদাঘাতে দুর্যোধন চোখে অন্ধকার দেখলেন। তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না—বসে পড়লেন, কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন; তারপর তিনি এমন আঘাত হানলেন ভীমকে যে, তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। পাণ্ডবেরা হাহাকার করে উঠলেন, ভাবলেন: ভীম বোধ হয় প্রাণ হারালেন। কিন্তু একটু পরেই ভীম সুস্থির হয়ে উঠলেন।

এই সময়ে কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন নিজের বাম উরুতে সশব্দে চড় মারলেন। তাতে ভীমের মনে পড়ল যে, তিনি বনগমনের প্রাক্কালে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে ভীম ও দুর্যোধন উভয়েই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এমন সময়ে সুবিধা পেয়ে ভীম তাঁর গদা ছুড়ে মারলেন দুর্যোধনকে। দুর্যোধন চকিতে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন এবং পরক্ষণেই বিষম তেজে গদাঘাত করলেন ভীমকে। সে আঘাতে ভীমের দেহ রক্তাক্ত হয়ে গেল, মূর্ছিতের মত নিশ্চল হয়ে রইলেন তিনি। কিন্তু কতক্ষণই বা! একটু পরেই ভীম দুর্যোধনকে আঘাত করতে উদ্যত হলেন। দুর্যোধন সে আঘাত এড়াবার জন্য লাফিয়ে উঠলেন। এই অবসরে ভীম সজোরে আঘাত

করলেন তাঁর দুটি উরুতে। দুর্যোধনের দুটি উরুই ভেঙে গেল। তিনি সশব্দে লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতে—পর্বতের চূড়া খসে পড়ল যেন!

নিষ্করুণ ভীম। মহারাজচক্রবর্তী দুর্যোধনকে ভূপতিত দেখেও তাঁর মনে দুঃখ জাগল না এতটুকু। দুর্যোধনকে তিরস্কার করে তিনি বললেন: "আমরা শঠতা করি না, কপট পাশাখেলায় শত্রুকে সর্বস্বহারা করি না আমরা, চোরের মত কারও ঘরে আগুনও লাগাই না। নিজেদের বাহুবলেই আমরা শত্রুকে বধ করি।" এই বলে তিনি তাঁর বাঁ পা দিয়ে দুর্যোধনের মস্তকদলন করলেন।

ভীমের এই আচরণে সকলেই তাঁর উপরে অসন্তুষ্ট হলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে তিরস্কার করে বললেন: "ছিঃ, ভীম, দুর্যোধন তোমার শত্রু হলেও মহারাজচক্রবর্তী, বিশাল কৌরব বাহিনীর অধিপতি তিনি,—চরণ দিয়ে স্পর্শ করো না তাঁকে। তিনি এখন মৃতপ্রায়। তাঁর জন্য শোক করাই তোমার উচিত—তাঁকে উপহাস করা উচিত নয়।"

এর পর যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে সম্বোধন করে সজলনেত্রে বললেন: "বৎস দুর্যোধন, দুঃখ করো না। এ মৃত্যু তোমারই কর্মফল। কিন্তু তুমি বীরের মত প্রাণ হারালে রণক্ষেত্রে—স্বর্গলাভ হবে তোমার।"

এদিকে বলরাম ভীমের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। গদাযুদ্ধে নাভির নিচে আঘাত করা শাস্ত্রে নিষেধ। ভীম তাই করেছেন; তার উপর আবার ভূপাতিত দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করে অত্যন্ত নীচভাবে অপমান করেছেন তাঁকে। এজন্য ভীমকে বধ করবার জন্য মহাক্রোধে লাঙল উঁচিয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন বলরাম। কৃষ্ণ কোন রকমে তাঁকে শান্ত করলেন, নইলে সেদিন নিশ্চিত প্রাণ হারাতেন ভীমসেন।

এর পর নিজেদের শিবিরে ফিরে গেলেন পাণ্ডবেরা।

পাণ্ডবেরা চলে গেলে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা আবার দুর্যোধনের কাছে এলেন। দুর্যোধনেব দুর্দশা দেখে মর্মাহত হলেন তাঁরা। বহু বন্ধুব মধ্যে ঐ তিনজন হতাবশিষ্টকে দেখে দুর্যোধনের চোখও জলে ভরে এল।

অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে বললেন: "মহাবাজ, পাণ্ডবেবা জঘন্য কৌশলে হত্যা কবেছে আমাব পিতাকে। কিন্তু তাতেও আমার তত মর্মবেদনা জাগেনি, যত জাগছে তোমাব এ অবস্থা দেখে। আমি শপথ করছি: "আজ পাণ্ডববন্ধু পাঞ্চালদের সবাইকে বধ করব আমি। মহাবাজ, তুমি অনুমতি দাও।"

এ কথা শুনে অতীব হৃষ্ট হলেন দুর্যোধন। আচার্য কৃপকে তিনি অনুরোধ করলেন অশ্বত্থামাকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করতে। অভিষেক-ক্রিয়া শেষ হলে কৃপ ও কৃতবর্মাকে নিয়ে সিংহনাদ করতে করতে অশ্বত্থামা প্রস্থান করলেন।

আর, সেই বিশাল প্রান্তরে অষ্টাদশদিবসব্যাপী কুলক্ষয়ী গৃহযুদ্ধান্তে ভগ্নোরু হয়ে পড়ে রইলেন মহারাজচক্রবর্তী দুর্যোধন। কোথায় আজ তাঁর মিত্রেরা? কোথায় তাঁব স্বজনবর্গ? কোথায় তাঁব রাজ্য ও ধনসম্পদ্? কঠিন প্রান্তরভূমি আজ তাঁব শয্যা, অনন্তপ্রসারিত অন্ধকার আকাশ তাঁর চন্দ্রাতপ, হিংস্রশ্বাপদের দল তাঁর পরিচারক!

সৌপ্তিকপর্ব

অশ্বত্থামা কর্তৃক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড

দুর্যোধনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক গহন বনে প্রবেশ করলেন কৃপাচার্য কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা। সেখানে এক বিশাল বটবৃক্ষের নিচে ভূতলে শুয়ে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা নিদ্রিত হলেন, কিন্তু গভীর রাত্রি পর্যন্ত অশ্বত্থামার চোখে ঘুম এল না। অতন্দ্র চোখে বসে বসে তিনি ভাবতে লাগলেন : কি করে তাঁর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবেন—কি করে শাস্তি দেবেন সেই পাপিষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্নকে যিনি অপকৌশলের সাহায্যে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন দ্রোণাচার্যকে।

সেই বটবৃক্ষে সহস্র সহস্র কাক নিঃশঙ্ক হয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল। সহসা এক ঘোরদর্শন বৃহৎ পেচক এসে বিস্তর কাকের প্রাণবধ করল।

এ ব্যাপার দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন-বধের উপায় খুঁজে পেলেন অশ্বত্থামা। তিনি স্থির করলেন : পাণ্ডবেরা এখন শিবিরে শুয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন আছেন,—এই সুযোগে এখনি অতর্কিতে তাঁদের আক্রমণ করে বধ করতে হবে।

এই সঙ্কল্প করে তিনি কৃপ ও কৃতবর্মাকে ঘুম থেকে জাগালেন। কৃপ তাঁকে এ পাপ-সঙ্কল্প ত্যাগ করার জন্য অনেক অনুরোধ করলেন—অনেক বোঝালেন। কিন্তু তাঁর কোন কথাতেই কর্ণপাত করলেন না অশ্বত্থামা—তিনি তৎক্ষণাৎ পাণ্ডবদের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করলেন। কৃপ এবং কৃতবর্মাও তাঁর পিছন পিছন গেলেন।

পাণ্ডব-শিবিরে পৌঁছে অশ্বত্থামা দেখলেন : এক বিরাটকায়

ভয়ঙ্কর পুরুষ সেই শিবিরের দ্বার রক্ষা করছেন। চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় তেজস্বী সে পুরুষকে দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। তাঁর পরনে রক্তমাখা বাঘছাল, তাঁর উত্তরীয় হল কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম, গলায় উপবীত হয়েছে সর্প; হাতে তাঁর নানান্ অস্ত্র। সেই পুরুষের মুখ নাক কান ও সহস্র চক্ষু থেকে প্রলয়ঙ্কর অগ্নিশিখা বেরচ্ছে!

নির্ভীক অশ্বত্থামা সেই পুরুষের প্রতি বহু অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু সমস্ত অস্ত্রই গ্রাস করে ফেললেন তিনি। অশ্বত্থামার সমস্ত অস্ত্র নিঃশেষ হয়ে গেলে, তিনি মহাদেবের স্তব করতে লাগলেন।

হঠাৎ সেখানে একটি স্বর্ণবেদী দেখা দিল এবং তাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অসংখ্য ভূত-প্রেত এসে নৃত্যগীত আরম্ভ করল। এই সব অদ্ভুত কাণ্ড দেখে কিছুমাত্র শঙ্কিত হলেন না অশ্বত্থামা। তিনি মহাদেবের উদ্দেশে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন: "ভগবন্, আমি আমার শরীর দিয়ে হোম করছি এই অগ্নিতে—আপনি এই বলি গ্রহণ করুন,—প্রসন্ন হন আমার প্রতি।"

সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিভে গেল, মিলিয়ে গেল সেই স্বর্ণবেদী ও ভূতপ্রেতের দল। আর, সেই ভয়ঙ্কর পুরুষের আকৃতি গেল বদলে—সবিস্ময়ে অশ্বত্থামা দেখলেন: ঐ পুরুষই স্বয়ং মহাদেব!

মহাদেব বললেন: "পাঞ্চালদের পরমায়ু ফুরিয়েছে—আজ তাঁদের জীবনান্ত হবে।" এই বলে তিনি অশ্বত্থামাকে একখানা খড়্গ দিলেন।

সেই খড়্গ নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করলেন অশ্বত্থামা। কৃপ ও কৃতবর্মা শিবিরদ্বারে পাহারা দিতে লাগলেন।

অষ্টাদশদিনব্যাপী কঠোর রণশ্রমের পর নিশ্চিন্তচিত্তে উত্তম শয্যায় শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছিলেন দ্রোণহন্তা পাঞ্চালবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন। শিবিরে প্রবেশ করে অশ্বত্থামা পা দিয়ে নিদ্রামগ্ন ধৃষ্টদ্যুম্নের গলা ও বুক চাপতে চাপতে হত্যা করলেন তাঁকে।

ধৃষ্টদ্যুম্নের আর্তনাদ শুনে বহু যোদ্ধার ঘুম ভাঙল। তাঁরা ছুটে এসে আক্রমণ করলেন অশ্বত্থামাকে। কিন্তু মহাদেবের দেওয়া খড়্গ দিয়ে অশ্বত্থামা তাঁদের বধ করলেন। অবশেষে শিখণ্ডী ও সমস্ত পাঞ্চালবীর এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে নিহত করে পাণ্ডব-শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন দ্রোণপুত্র।

পাণ্ডব-শিবিরে সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড শেষ করে কৃপ ও কৃতবর্মাকে নিয়ে অশ্বত্থামা দুর্যোধনের কাছে গেলেন। দুর্যোধন তখন মৃতপ্রায়। অশ্বত্থামার মুখে সকল সংবাদ শুনে অত্যন্ত হৃষ্ট হলেন তিনি, অশ্বত্থামাকে বললেন: "গুরুপুত্র, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণও যে কাজ করতে পারেননি, সেই দুষ্কর কর্ম তুমি করলে। মঙ্গল হোক তোমার। আজ আমি নিজেকে দেবরাজ ইন্দ্রের সমান মনে করছি। এখন আমি মরব। এই বলে কুরুবংশ-ধ্বংসকারী পাণ্ডবদের চিরশত্রু কুরুরাজ দুর্যোধন প্রাণত্যাগ করলেন।

অশ্বত্থামার শাস্তি

পরদিন প্রভাতে অশ্বত্থামার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখে হাহাকার পড়ে গেল পাণ্ডব-শিবিরে।

পঞ্চপুত্রের শোকে আকুল হয়ে ভূলুণ্ঠিত হলেন যুধিষ্ঠির। তাঁর ভ্রাতারা তাঁকে ধরে ওঠালেন। তিনি বিলাপ করে বলতে লাগলেন: "জয়ী হয়েও পরাজিত হলাম আমরা। যে রাজপুত্রেরা

ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণের হাত থেকেও মুক্তি পেয়েছিলেন, তাঁরা আজ নিহত হলেন আমাদের অসাবধানতার জন্য ! সমুদ্র পেরিয়ে এসে বণিকের তরী ডুবে গেল ক্ষুদ্র নদীতে শুধু সতর্কতার অভাবে !"

পঞ্চ বীরপুত্রের শোকে আত্মহারা হয়ে পড়লেন দ্রৌপদী। কোন সান্ত্বনা মানতে চাইলেন না তিনি। অবশেষে তিনি কাঁদতে কাঁদতে যুধিষ্ঠিরকে বললেন: "রাজা, তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রধর্ম পালন করে যুদ্ধজয়ী হয়েছ—ক্ষত্রধর্ম পালন করে পুত্রদের জীবনান্ত ঘটিয়েছ, এখন পরম সুখে রাজ্যভোগ কর। তুমি যদি পাপী অশ্বত্থামাকে যুদ্ধে বধ না কর, তবে আমি এখানে বসেই উপবাসে প্রাণত্যাগ করব।" এই বলে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করলেন দ্রৌপদী।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: অশ্বত্থামা এখন দুর্গম বনে চলে গেছেন—তাঁকে বধ করলেও তা দেখতে পাবেন না দ্রৌপদী।

এ কথা শুনে দ্রৌপদী বললেন: "শুনেছি, অশ্বত্থামা তাঁর মাথায় একটি মণি নিয়ে জন্মেছেন। তুমি যদি মণিটি নিয়ে আসতে পার, তবেই এ জীবন রাখব আমি।"

যুধিষ্ঠির ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তা দেখে দ্রৌপদী ভীমকে বললেন: "হে ক্ষত্রিয়, হে বীর, তুমি রক্ষা কর আমার প্রতিজ্ঞা—রক্ষা কর আমাকে। জতুগৃহদাহে তুমি উদ্ধার করেছ তোমার ভাইদের আর মা-কুন্তীকে, হিড়িম্ব বক আর কির্মীরকে বধ করেছ তুমি, কীচকের হাত থেকে আমাকে ত্রাণ করেছ; তুমিই নিপাত করেছ শতভ্রাতা দুর্যোধনকে, তোমারই বীর্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে পাণ্ডবেরা। হে মহাবাহু, এখন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর—শাস্তি দাও পাপিষ্ঠ অশ্বত্থামাকে।"

মহাবল ভীমসেন তৎক্ষণাৎ ধনুর্বাণ নিয়ে রথে চড়ে যাত্রা করলেন, নকুল তাঁর সারথি হলেন।

মহাবীর অশ্বত্থামা অস্ত্রবিদ্যায় পরম পারদর্শী ছিলেন। উপরন্তু তিনি তাঁর পিতা দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে 'ব্রহ্মশিব' নামে এক প্রলয়ঙ্কর অস্ত্র পেয়েছিলেন। প্রিয়তম শিষ্য অর্জুনকে ছাড়া আর কাউকে সে অস্ত্র দেননি আচার্য। কৃষ্ণ এ তথ্য জানতেন। তাই তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে তাঁর রথে তুলে নিয়ে দ্রুতবেগে ভীমের অনুসরণ করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা ভীমের নাগাল পেলেন। তারপর সকলে মিলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁরা ব্যাস ও অন্যান্য ঋষিদের মধ্যে অশ্বত্থামাকে বসে থাকতে দেখলেন। কুশের তৈরী কৌপীন পরে ঘৃতাক্ত দেহে ধুলো মেখে বসে আছেন ক্রূরকর্মা অশ্বত্থামা!

ভীম ধনুর্বাণ নিয়ে অশ্বত্থামার দিকে ছুটে গেলেন। অশ্বত্থামা আতঙ্কিত হয়ে একগাছি কাশ ছুড়ে দিয়ে বললেন: "পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হোক।" অমনি সেই কাশে প্রলয়ঙ্কর আগুন জ্বলে উঠল।

এ দেখে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ। ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন: "অর্জুন, অর্জুন, অশ্বত্থামা তাঁর পিতৃদত্ত ভীষণ ব্রহ্মশির-অস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন। এ অস্ত্র মানুষের উপরে প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছিলেন আচার্য, কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁর পিতার নিষেধ লঙ্ঘন করেছেন। তুমিও তোমার দ্রোণদত্ত ব্রহ্মশির নিক্ষেপ করে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ কর।"

কৃষ্ণের পরামর্শ শুনে অর্জুনও ব্রহ্মশির নিক্ষেপ করে বললেন: "অশ্বত্থামার মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক আমাদের এবং আর সকলের; কেবল এই অস্ত্রে নিবারিত হোক অশ্বত্থামার অস্ত্র।"

তখন সেই দুই অনলোদ্গারী অস্ত্রের সঙ্ঘাতে প্রলয় ঘটবার উপক্রম হল। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে মহামুনি নারদ ও ব্যাস এসে দুই অগ্নিরাশির মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে নিজের নিজের অস্ত্র ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করলেন অর্জুন আর অশ্বত্থামাকে।

কিন্তু ব্রহ্মশির-অস্ত্র প্রত্যাহার করতে হলে ব্রহ্মচর্য ও বিবিধ ব্রত পালন করা প্রয়োজন। অর্জুন সেসব পালন করেছিলেন, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের অস্ত্র প্রত্যাহার করতে পারলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা সেসব পালন করেননি, স্নতরাং তিনি তাঁর অস্ত্র ফিরিয়ে নিতে অক্ষম হলেন। তখন তিনি তাঁর অস্ত্র পাণ্ডবনারীদের গর্ভে নিক্ষেপ করলেন, তাতে তাঁদের গর্ভস্থ সকল সন্তান বিনষ্ট হল। অশ্বত্থামাও তাঁর মাথার মণি কেটে পাণ্ডবদের দিলেন।

কৃষ্ণ তখন অশ্বত্থামাকে বললেনঃ "তোমার অস্ত্র সফল হল বটে, কিন্তু অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভে যে সন্তান তোমার অস্ত্রে মারা পড়ল, তাঁকে আমি আবার বাঁচিয়ে তুলব। সেই শিশুর নাম হবে পরীক্ষিৎ, কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করে ষাট বছর কুরুরাজ্য পালন করবে সে। স্নতরাং, তোমার অস্ত্র সফল হয়েও ব্যর্থ হবে, অশ্বত্থামা।"

কৃষ্ণ আরও বললেনঃ "অশ্বত্থামা, তুমি বীর হয়েও কাপুরুষ। বালক-বধেই তোমার আনন্দ। নরাধম, আমার অভিশাপে তিন হাজার বছর ধরে তুমি জনহীন দেশে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হয়ে অসহায় অবস্থায় বেঁচে থাকবে।"

ভীম এসে দ্রৌপদীকে অশ্বত্থামার শিরোমণিটি দিলেন। মণিটি পেয়ে সান্ত্বনা লাভ করলেন পুত্রশোকার্তা দ্রৌপদী। তাঁর অনুরোধে যুধিষ্ঠির সেই মণিটি নিজের মস্তকে ধারণ করলেন।

স্ত্রীপর্ব

লৌহভীম-চূর্ণ ও গান্ধারীর ক্রোধ

শতপুত্রের মৃত্যু-শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ

> "অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ।
> ন তে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পরিবেদনা॥
> শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
> দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥"

—মানুষ অদৃশ্য স্থান থেকে আসে, আবার অদৃশ্য স্থানেই চলে যায়; তারা আপনার নয়, আপনিও তাদের নন; তবে খেদ কিসের? শোকের কারণ হাজার হাজার, ভয়েরও কারণ শত শত; সে সব কারণ মূঢ়কেই অভিভূত করে, পণ্ডিতকে নয়।

পরম ধার্মিক মহামতি বিদুর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দেননি। তিনিও এসে বিধিমতে সান্ত্বনা দিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে। শেষে ব্যাসদেব এসে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলেন এবং গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতি পুরনারীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে নিহত কুরুবীরদের তর্পণ করার জন্য যাত্রা করলেন।

পাণ্ডবগণও কৃষ্ণ এবং অন্যান্য হতাবশিষ্ট বীরদের নিয়ে পথিমধ্যে দেখা করলেন ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে। দ্রৌপদী এবং পতিপুত্রহীনা পাঞ্চাল নারীরাও তাঁদের সঙ্গে এলেন।

পাণ্ডবগণ প্রণাম করলেন জ্যেষ্ঠতাতকে। ধৃতরাষ্ট্র প্রীতিশূন্যচিত্তে নেহাত দায়ে-ঠেকাভাবে আলিঙ্গন করলেন যুধিষ্ঠিরকে। তারপর ভীমকে খুঁজতে লাগলেন তিনি। কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ভীমকে দূরে

সরিয়ে দিয়ে ভীমের একটি পূর্ণাবয়ব লৌহমূর্তি এনে ধৃতরাষ্ট্রের সামনে রাখলেন। অযুত হস্তীর ন্যায় বলবান্ ধৃতরাষ্ট্র সজোরে আলিঙ্গন করে চূর্ণ করে ফেললেন সেই মূর্তিটিকে, তারপর উচ্চৈঃস্বরে 'হা হা ভীম' বলে কেঁদে উঠলেন।

তখন কৃষ্ণ বললেন ধৃতরাষ্ট্রকে ঃ "মহারাজ, শোক করবেন না, আপনি ভামকে বধ করেননি—চূর্ণ করেছেন তার লৌহমূর্তি। আপনি যে আক্রোশবশে ভীমকে বিনাশ করার অভিপ্রায় করেছিলেন, আমি বুঝতে পেরেছিলাম তা। তাই আমি ভীমকে সরিয়ে তাঁর লৌহমূর্তি এনে দিয়েছিলাম আপনাকে। কিন্তু মহারাজ, এ অন্যায় ক্রোধ কেন আপনার? আমাদেব নিষেধ না মেনে আপান আপনার পুত্র দুষ্ট দুর্যোধনের কথা শুনে চলেছেন,—তাই না আপনার আজ এ দশা? দোষ ত আপনারই, মহারাজ। তাছাড়া, এখন আপনি ভীমকে বধ করলেও ত আপনার পুত্রেরা বেঁচে উঠবেন না।"

ধৃতরাষ্ট্র লজ্জিত হয়ে বললেন ঃ "তোমার কথাই সত্য, কৃষ্ণ। আমার শতপুত্রের অধিকাংশকেই ভীম বধ করেছে, তাই তার উপব আমার ক্রোধ হয়েছিল। আমাকে ক্ষমা কর, কৃষ্ণ। আমার পুত্রেরা আজ বেঁচে নেই,—এখন পঞ্চপাণ্ডবই আমার পুত্রসম।" এই বলে তিনি পাণ্ডবদের আলিঙ্গন করে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

মা-গান্ধারীও তাঁর পুত্রহন্তা পাণ্ডবদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হয়েছিলেন। তিনি মনস্থ করেছিলেন ঃ কঠিন অভিশাপ দেবেন যুধিষ্ঠিরকে। মহর্ষি ব্যাস টের পেলেন গান্ধারীর মনোভাব। তিনি এসে দুর্যোধন-জননীকে বললেন ঃ "গান্ধারী, তুমি ক্রুদ্ধা হয়ো না। তুমিই ত বলতে ঃ 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'—যে পক্ষে ধর্ম আছে, জয় হবে সে পক্ষেরই। পাণ্ডবেরা ধর্মবলেই জয়ী হয়েছে। তুমি তাঁদের উপর ক্রুদ্ধা হয়ো না, মা।"

গান্ধারী বললেন : "ভগবন্, আমি পাণ্ডবদের দোষ দিচ্ছি না, তাঁদের বিনাশও কাম্য নয় আমার। তবে এ কথা সত্য যে পুত্রশোকে আমি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছি। কিন্তু ভগবন্, ভীম অন্যায়ভাবে গদাপ্রহার করে বধ করেছে দুর্যোধনকে, রক্তপান করেছে দুঃশাসনেব। বলুন, ভগবন্, এই কি ধর্ম—এই কি ন্যায় ?"

ভীম এসে ক্ষমা চাইলেন গান্ধারীর কাছে। গান্ধারী তাঁকে ক্ষমা কবলেন বটে, কিন্তু বললেন : "বৎস, শতভ্রাতা কৌরবদের মধ্যে একজনকেও কেন জীবিত বাখলে না, যাতে সে তার বৃদ্ধ মাতাপিতার অবলম্বন হতে পারে ?" এই বলে তিনি সক্রোধে জিজ্ঞাসা কবলেন : "কোথায় সেই রাজা যুধিষ্ঠির ?"

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে যুধিষ্ঠির এসে গান্ধাবীর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বিয়ে হবাব সময় থেকে গান্ধারী পুরু কাপড়ে নিজের চোখ বেঁধে রেখেছিলেন। সেই বস্ত্রাবরণের সামান্য ফাঁক দিয়ে গান্ধারীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল যুধিষ্ঠিরের হাতের সুন্দর নখগুলিব উপর ; তার ফলে নখগুলি তাঁর কুৎসিত হয়ে গেল চিরদিনের মত ! এতে গান্ধারীর ক্রোধ দূব হল ; তিনি মায়েব মত সান্ত্বনা দিতে লাগলেন পাণ্ডবদের এবং কুন্তী ও দ্রৌপদীকে।

তখন সকলে মিলে কুরুক্ষেত্রে গেলেন। সেখানে নিজ নিজ পতি-পুত্রের মৃতদেহ জড়িয়ে কুরুবংশের সমস্ত নারীরা কাঁদতে লাগলেন—কাঁদলেন শতভাই কৌরবের পত্নীরা আর পুত্রবধূরা, কাঁদলেন অভিমন্যুর মাতা সুভদ্রা আর তাঁর পত্নী উত্তরা, কাঁদলেন কর্ণের পত্নী, জয়দ্রথেব পত্নী, দ্রোণের পত্নী। কুরুক্ষেত্রের সেই কান্নার রোলে আলোড়িত হল দিগ্‌দিগন্ত।

পতিপুত্রহারা নারীদের এই বিলাপ শুনে আবার ধৈর্য হারালেন গান্ধারী। তিনি কৃষ্ণকে বললেন : "কৃষ্ণ, উভয় পক্ষই ত তোমার

কথা শুনত; তোমার সামর্থ্যও ছিল, সৈন্যবলও ছিল। তবে কেন তুমি ঘটতে দিলে এ সর্বনাশা যুদ্ধ? তুমিই দোষী, কৃষ্ণ। আমি অভিশাপ দিচ্ছি: আজ থেকে ছত্রিশ বছর পরে জ্ঞাতিহীন বন্ধুহীন পুত্রহীন ও বনচারী অবস্থায় অপকৃষ্ট উপায়ে তুমি নিহত হবে;—নির্বংশ হবে তুমি।"

এর পর সকলে মিলে কুরুক্ষেত্রে নিহত বীরদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করলেন।

শান্তিপর্ব

রাজধর্ম

কুরুক্ষেত্রে নিহত বীরদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যুধিষ্ঠির। তিনি আর রাজ্যভার নিতে চাইলেন না, অর্জুনকে বললেন: "ক্ষত্রধর্মকে ধিক্! আমরা ক্ষত্রিয় বলেই আমাদের এই যুদ্ধ করতে হল—বধ করতে হল এত আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবকে। না-না, অর্জুন, জ্ঞাতিরক্তে রঞ্জিত এই সিংহাসনে আমার প্রয়োজন নেই; তুমিই রাজ্যশাসন কর: আমি সন্ন্যাসগ্রহণ করব।"

যুধিষ্ঠিরের এ কথা শুনে তাঁর ভ্রাতারা, দ্রৌপদী, কৃষ্ণ, মহামুনি ব্যাস ও মহর্ষি দেবস্থান তাঁকে নানা উপদেশ দিয়ে প্রবোধ দিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের মনস্তাপ দূর হল, তিনি স্বজনবন্ধুসহ হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। সেখানে মহাসমারোহে তাঁর অভিষেক হল। তের বছরেরও অধিককাল ধরে নানা দুঃখভোগের পর আবার সিংহাসনে বসলেন ধর্মরাজ।

দেবরাজ ইন্দ্রের মত প্রজাপালন করতে লাগলেন যুধিষ্ঠির। সকলেই তাঁর শাসনে অতীব সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু জ্ঞাতিবধজনিত বিষাদে আবার মুহ্যমান হয়ে পড়লেন তিনি। এই সময়ে একদিন নিজের মনোদুঃখ লাঘব করার জন্য কৃষ্ণের ভবনে গেলেন। সেখানে গিয়ে যুধিষ্ঠির দেখলেন: কৃষ্ণ ধ্যানস্থ হয়ে আছেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন: "কার ধ্যান করছ, কৃষ্ণ?"

কৃষ্ণ বললেন: "এখন উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়েছে। আর কদিন

পরেই পরম প্রাজ্ঞ ভীষ্ম দেহত্যাগ করবেন। আমি তাঁরই কথা ভাবছিলাম।"

যুধিষ্ঠির এ কথা শুনে বললেন: "চল, কৃষ্ণ, আমরা পিতামহের কাছে যাই।"

তখন কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির সবান্ধবে কুরুক্ষেত্রে গেলেন। সেখানে ওঘবতী-নদীর তীরে শরশয্যায় শুয়ে নিজের মৃত্যুর জন্য শুভদিনের প্রতীক্ষা করছিলেন ভীষ্ম। কৃষ্ণ তাঁকে বললেন: "পুরুষশ্রেষ্ঠ, সকল প্রকার ধর্মের সমস্ত তত্ত্বই আপনার জানা আছে। আপনার দেহত্যাগে দু মাসও আর বিলম্ব নেই। আপনি দেহত্যাগ করলে সমস্ত জ্ঞানই লুপ্ত হবে—পৃথিবী অন্ধকার হবে। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি: জ্ঞাতিবধের দুঃখে অত্যন্ত মনস্তাপ পাচ্ছেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির,—আপনি উপদেশ দিয়ে এঁর মনস্তাপ দূর করুন।"

ভীষ্ম এ কথা শুনে বললেন যে, অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি, তাঁর বাক্‌শক্তি ক্ষীণ হয়েছে, বোধও প্রায় লোপ পেয়েছে,—সুতরাং তিনি এখন কি করে উপদেশ দেবেন যুধিষ্ঠিরকে?

তখন কৃষ্ণ ভীষ্মকে বর দিলেন যে, এখন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর দেহের সকল দুর্বলতা সকল গ্লানি দূর হবে, কোন মোহ কষ্ট ক্ষুৎপিপাসা থাকবে না তাঁর, সকল তত্ত্ব অবগত হবেন তিনি, তাঁর বুদ্ধি হবে তীক্ষ্ণ, তাঁর জ্ঞানচক্ষু হবে সর্বদর্শী।

এই বরদানের পরই সূর্য অস্তাচলগামী হলেন। তখন সেদিনের মত সকলে ভীষ্মের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

পরদিন থেকে যুধিষ্ঠির সদলবলে নিত্য যেতে লাগলেন ভীষ্মের

কাছে। এবং দেহত্যাগ না করা পর্যন্ত ভীষ্ম নিত্যই তাঁকে দিলেন নানান উপদেশ, শোনালেন নানান তত্ত্ব।

প্রথমেই তিনি বললেন রাজধর্মের সম্বন্ধে।

ভীষ্ম বললেন : রাজাকে সর্বদা উদ্যোগী হয়ে কর্ম করতে হবে— পুরুষকার ভিন্ন কেবল দৈবে রাজকার্য সিদ্ধ হয় না। প্রজাদের সঙ্গে তিনি সর্বদা সদয় ব্যবহার করবেন যাতে তারা বাধ্য থাকে। রাজা সর্বদা কোমল হবেন না, কঠোর হবেন না,—বসন্তের সূর্যের মত নাতিশীতোষ্ণ হবেন তিনি। কাউকে তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস বা অত্যন্ত অবিশ্বাস করবেন না। তিনি সাধু লোকের ধন হরণ করবেন না, অসাধুরই ধন নেবেন এবং তা সাধু লোককে দান করবেন।

পরদিন ভীষ্ম বললেন : পুরাকালে রাজা ছিল না, রাজ্যও ছিল না, শাস্তিও ছিল-না, অপরাধীও ছিল না। সকল মানুষ তখন ধর্ম মেনে চলত—কেউ কোন অপরাধ করত না, তাই রাজা রাজ্য বা শাস্তির প্রয়োজনও ছিল না। ক্রমে মানুষের ধর্মজ্ঞান লুপ্ত হল। ফলে তখন রাজপদেরও সৃষ্টি হল।

আরেক দিন ভীষ্ম বললেন : রাজাকে ইন্দ্রিয়জয়ী হতে হবে। তিনি তাঁর কর্মচারী, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন এবং সামন্তরাজদের কার্য-কলাপ লক্ষ্য করার জন্য বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ গুপ্তচর রাখবেন। সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ লোককে তিনি বিচারকের পদ দেবেন এবং শুল্ক-আদায়ের জন্য বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করবেন। প্রবল শত্রু আক্রমণ করলে রাজা দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নেবেন এবং সাধ্যমত শস্য-সংগ্রহ করবেন ; যে সব শস্য বা শস্যক্ষেত্র শত্রুর হাতে পড়া সম্ভব, সেগুলি তিনি পুড়িয়ে ধ্বংস করবেন ; নদীর সেতু তিনি ভেঙে ফেলবেন, এবং পানীয় জল সরিয়ে আনবেন অথবা বিষ মিশিয়ে দেবেন তাতে।

ভীষ্ম আরও বললেন : চোর যদি প্রজার ধন হরণ করে এবং

রাজা যদি তা উদ্ধার না করতে পারেন, তবে সেই অক্ষম রাজা রাজকোষ থেকেই প্রজার ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য।

ধর্মরাজকে উপদেশ দিলেন ভীষ্ম: "যুধিষ্ঠির, তুমি যদি সর্বদাই কোমলস্বভাব, অতি সৎ, অতি ধার্মিক, উদ্যমহীন ও দয়ালু হও, তবে লোকে তোমাকে মানবে না।"

আরেক দিন ভীষ্ম বললেন: কোন রাজকর্মচারী যদি রাজধন চুরি করে, তবে যে লোক তা রাজাকে জানাবে, রাজা তাকে রক্ষা করবেন, নচেৎ চোর-কর্মচারী সর্বনাশ করবে সে লোকের। যিনি লজ্জাশীল ইন্দ্রিয়জয়ী সত্যবাদী সরল ও উচিতবক্তা, তিনিই রাজ-সভাসদ্ হবার যোগ্য।

এর পর একদিন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন: পণ্ডিত ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক বড় পিতা, পিতার চেয়েও অনেক বড় মাতা, এবং গুরু মাতাপিতার চেয়েও বড়।

ভীষ্ম উপদেশ দিলেন: "যদি কেউ ক্রুদ্ধ হয়ে কর্কশ বাক্য বলে, তবে তা গ্রাহ্য করো না। যে নরাধম নিন্দার কাজ করে আত্ম-প্রশংসা করে, তাকে উপেক্ষা করবে। দুষ্ট খলের সঙ্গে বাক্যালাপ করো না কখনও। আর, মনে রেখো, যুধিষ্ঠির, নিরপেক্ষভাবে দণ্ডবিধান করে প্রজাপালন করার নামই ধর্ম। এ কথাও মনে রেখো যে, রাজকোষ ক্ষয় পেলে রাজারও বলক্ষয় হয়।"

আপদ্ধর্ম

ভীষ্ম বললেন যুধিষ্ঠিরকে: "আপৎকালে অনেক সময়ে অধর্মও ধর্ম হয় এবং ধর্মও অধর্ম হয়। সঙ্কটকালে আত্মরক্ষা করাই বড় কথা।" এই বলে ভীষ্ম এ সম্বন্ধে কয়েকটি উপাখ্যান ও কাহিনী বললেন।

আপদ্ধর্ম সম্বন্ধে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যে সব উপাখ্যান বললেন, তাদের একটির নাম হল : তিন মৎস্যের উপাখ্যান।

কোন একটি জলাশয়ে তিনটি শোল মাছ থাকত। তাদের নাম হল : 'অনাগতবিধাতা' অর্থাৎ যে আগে থেকেই ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করে বা প্রস্তুত থাকে, 'প্রত্যুৎপন্নমতি' অর্থাৎ যে আগে থেকে প্রস্তুত না থাকলেও উপস্থিতবুদ্ধিবলে সময়মত ব্যবস্থা করতে পারে, এবং 'দীর্ঘসূত্র' অর্থাৎ যে সকল কাজে দেরি করে।

একদিন সেই জলাশয়ে মাছ ধরতে এল জেলেরা। মাছ ধবার সুবিধার জন্য তাবা সে জলাশয় থেকে জল বার করে দিতে লাগল।

জলাশয়েব জল কমছে দেখে অনাগতবিধাতা অন্য মাছ দুটিকে বলল : "আশঙ্কা হচ্ছে, এ জলাশয়ে থাকলে বিপদে পড়ব আমরা। চল, পালাবার পথ বন্ধ হওয়ার আগেই আমরা এ জলাশয় ছেড়ে অন্য জলাশয়ে যাই। কাবণ, আগে থাকতেই যে ভবিষ্যৎ বিপদ্ এড়াবার ব্যবস্থা করে, সে বিপন্ন হয় না কখনও।"

এ কথা শুনে দীর্ঘসূত্র বলল : "কোন বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়।"

প্রত্যুৎপন্নমতি বলল : "বিপদ্ আসুক আগে, তখন ব্যবস্থা করা যাবে।"

সঙ্গীদের এ কথা শুনে অনাগতবিধাতা একাকী অন্য জলাশয়ে চলে গেল।

তারপর একদিন মাছ ধরতে এল জেলেরা। অন্য মাছদের সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নমতি এবং দীর্ঘসূত্রও ধরা পড়ল। জেলেরা তাদের ধরা সমস্ত মাছগুলিকে দড়ি দিয়ে গাঁথতে লাগল। প্রত্যুৎপন্নমতি তখন দড়ি কামড়ে রইল; জেলেরা ভাবল : তাকেও গাঁথা হয়েছে। এবার সমস্ত মাছগুলিকে জীবিত রাখার জন্য তাদের অন্য জলাশয়ে

নিয়ে গেল জেলেরা। তারপর সেগুলিকে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় ঐ জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হল এবং দড়ির একটি প্রান্ত তীরে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হল। এই অবসরে প্রত্যুৎপন্নমতি তাব মুখের দড়ি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। আব, মন্দবুদ্ধি দীর্ঘসূত্র প্রাণ হাবাল।

এই উপাখ্যানটি শেষ কবে ভীষ্ম বললেন: "যাঁরা বিচাব কবে যুক্তি-অনুসারে কাজ কবেন, তাঁরাই সম্যক্ ফললাভ করেন। কোন বিপদ্ স্পর্শ করতে পাবে না তাদের।"

ভীষ্ম বললেন: "অবস্থাভেদে শত্রুও বন্ধু হয়, বন্ধুও শত্রু হয়। দেশ-কাল বিবেচনা করে স্থির কবতে হয়: কে বিশ্বাসেব যোগ্য এবং কাব সঙ্গে বিবোধ কবা উচিত।" এই বলে ভীষ্ম মার্জার ও মূষিকেব উপাখ্যানটি বললেন।

গহন এক অরণ্যে বিশাল এক বটগাছ ছিল। সেই বটগাছের শাখায় থাকত 'লোমশ' নামে একটি বিড়াল, আব তার মূলদেশে একটি গর্তেব মধ্যে বাস করত 'পলিত' নামে একটি ইঁদুব।

এক চণ্ডাল পশুপক্ষী ধরার জন্য নিত্য ফাঁদ পাতত সেই গাছের নিচে। একদিন হঠাৎ বিড়াল সেই ফাঁদে আটকা পড়ল। ইঁদুর দেখল: সেই ফাঁদের মধ্যে আমিষ খাদ্য আছে। সে তখন মনে মনে বিড়ালকে উপহাস কবে ফাঁদের উপর থেকে সেই খাদ্য খেতে লাগল।

এমন সময়ে একটা বেঁজি ও একটা পেঁচা এসে সেখানে উপস্থিত হল ইঁদুরটিকে ধরে খাবার জন্য। ইঁদুব দেখল: তার বিষম সঙ্কট—একসঙ্গে তিন শত্রু এসে উপস্থিত হয়েছে তার। সে স্থির করল: এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সে তার সবচেয়ে বড়

শত্রু বিড়ালেব সাহায্য নেবে, কাবণ বিড়াল নিজেও সাঙ্ঘাতিক বিপদে পড়েছে।

এই স্থির করে মূষিক বলল মার্জারকে: "ওহে লোমশ, বড় বিপদে পড়েছ, দেখছি। আমিও সঙ্কটাপন্ন। ঐ দেখ, বেঁজি আব পেঁচা এসে উপস্থিত হয়েছে আমাকে ধরে খাবার জন্য। এখন তুমি যদি আমাকে রক্ষা কর, তবে আমিও রক্ষা করতে পারব তোমাকে। তা এস, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, আমরা সন্ধি করি।"

মার্জার বলল: "আমি বাজী আছি, পলিত,—সন্ধি হক তোমাতে আমাতে।"

ইঁদুরটি তখন বিড়ালেব বুকের মধ্যে আশ্রয় নিল; ফলে, বেঁজি ও পেঁচা হতাশ হয়ে চলে গেল। এমনিভাবে নিজে বিপন্মুক্ত হয়ে মার্জাবের প্রাণ বাঁচাতে উদ্যত হল মূষিক। সে ধীরে ধীরে ফাঁদেব সমস্ত গিঁটগুলি কেটে ফেলল, কিন্তু প্রধান গিঁটটি রেখে দিল।

এ দেখে মার্জার বলল মূষিককে: "একি, ভাই পলিত, ও গিঁটটি আবার রেখে দিলে কেন! আগে শত্রু ছিলাম আমরা, তখন অনেক অত্যাচার করেছি তোমাব উপবে। তুমি কি এখনও আমাব সে সব অপবাধ মনে রেখেছ? বিশ্বাস কর, পলিত, এখন আমি সত্যিই তোমার বন্ধু। বাঁচাও, ভাই, আমাকে।"

মূষিক বলল: "ভাই লোমশ, আমিও এখন সত্যিই তোমার বন্ধু। তবে, বুদ্ধিমান্ লোক সর্বদা সাবধানে চলে। আমিও তাই এখনই তোমাকে সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত করব না, তাহলে হয়ত পুরাতন শত্রুভাব জেগে উঠবে তোমার মনে—হয়ত তুমি হত্যা করবে আমাকে। কাল চণ্ডাল আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঐ শেষ গিঁটটি কেটে দেব,—তখন তুমি প্রাণভয়ে তাড়াতাড়ি গাছের শাখায় আশ্রয় নেবে, আমিও ঢুকব আমার গর্তে।"

মূষিক তার কথা রাখল। পরদিন চণ্ডাল আসতেই সে বিড়ালটিকে সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিড়াল গিয়ে উঠল গাছের ডালে আর ইঁদুর গিয়ে ঢুকল তার গর্তে। চণ্ডাল হতাশ হয়ে চলে গেল।

এর কয়েক দিন পরে ইঁদুরটিকে ডেকে বিড়াল বলল: "বন্ধু পলিত, আর তুমি আমার কাছে আসছ না কেন? তুমি সবান্ধবে এস আমার বাড়িতে; আমার আত্মীয়স্বজন সবাই সম্মান করবে তোমাকে। পরম বুদ্ধিমান্ তুমি; তুমি আমার মন্ত্রী হয়ে পিতার মত উপদেশ দাও আমাকে।"

মূষিক বলল: "হে লোমশ, বন্ধুত্ব বা শত্রুতা চিরস্থায়ী নয়—প্রয়োজন-অনুসারেই বন্ধুত্ব বা শত্রুতা হয়। তুমি আর আমি জন্মশত্রু। যে কারণে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল, সে কারণ আর নেই; সুতরাং, আমরা শত্রু হয়েছি আবার। আমি তোমার যে উপকার করেছি, তার জন্য যদি সত্যিই আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে, তবে আমি যখন অসতর্ক থাকব, তখন আমার অনুসরণ করো না।"

উপাখ্যানটি বলা শেষ করে ভীষ্ম বললেন: "যুধিষ্ঠির, যে বুদ্ধিমান্, সে মূষিকের মত দুর্বল হয়েও একাকী বুদ্ধিবলে বহু শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। পূর্বে যারা শত্রু ছিল, তারা যদি বন্ধুত্বস্থাপনের চেষ্টা করে, তাহলে বুঝতে হবে: পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের মধ্যে যে অধিক বুদ্ধিমান্, সে অন্যকে বঞ্চনা করবে; সে নির্বোধ, সে বঞ্চিত হবে।"

এর পর ভীষ্ম মহামুনি বিশ্বামিত্রের জীবনের একটি কাহিনী শোনালেন যুধিষ্ঠিরকে।

বহুকাল আগে একবার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয় দেশে। তখন চোর, রাজা ও রাজপুরুষদের অত্যাচারে লোকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। খাদ্যের অভাবে মানুষ পরস্পরের মাংস খেতে আরম্ভ করল।

এই সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধার্ত হয়ে দেশে দেশে খাদ্যের সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলেন। একদিন তিনি মৃতপ্রায় অবস্থায় এক চণ্ডাল-পল্লীতে উপস্থিত হলেন, সেখানে দেখলেন : এক চণ্ডালের গৃহে সদ্যোনিহত কুকুরের মাংস আছে।

বিশ্বামিত্র বিবেচনা করলেন : প্রাণ বাঁচানর জন্য চুরি করলেও দোষ হয় না, কুকুরের মাংস খেলেও দোষ হয় না। তাই তিনি সেদিন গভীর রাত্রে কুকুরের মাংস চুরি করতে সেই চণ্ডালের গৃহে প্রবেশ করলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বিশ্বামিত্রের! চণ্ডাল জেগে উঠে ধরে ফেলল তাঁকে এবং বধ করতে উদ্যত হল। বিশ্বামিত্র তখন প্রাণের দায়ে আত্মপরিচয় দিলেন চণ্ডালকে।

চণ্ডাল চমৎকৃত হল। সে সসম্ভ্রমে হাতজোড় করে বলল বিশ্বামিত্রকে : "এমন কাজ করবেন না, মহামুনি। তাহলে আপনার ধর্মহানি হবে। কুকুরের মাংস অতি জঘন্য, এ মাংস ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য। আজ ক্ষুধার তাড়নায় এ অন্যায় করবেন না, মহামুনি।"

বিশ্বামিত্র তাকে ধমক দিয়ে বললেন : "থামাও তোমার বক্‌বকানি। আমাকে উপদেশ দিতে হবে না তোমার।"

এই বলে তিনি সেই কুকুরের মাংস নিয়ে চলে গেলেন। তারপর তিনি সেই মাংস খাবার আগে দেবগণ ও পিতৃগণকে উৎসর্গ করে দিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রচুর বারিবর্ষণ করে পৃথিবীকে শস্যে ভরে তুললেন, এবং বিশ্বামিত্রের পাপ নষ্ট হল, পরমগতি লাভ করলেন তিনি।

যুধিষ্ঠিরকে এই কাহিনী শুনিয়ে ভীষ্ম বললেন : "বিপদে পড়লে বিদ্বান্ লোকের যে কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করা উচিত, কারণ তিনি বেঁচে থাকলে জগতের কল্যাণসাধন করে অনেক পুণ্য অর্জন করতে পারবেন।

এই রকম আরও কতকগুলি সুন্দর সুন্দর কাহিনী ও উপাখ্যান শুনিয়ে যুধিষ্ঠিরকে নানা উপদেশ দিলেন ভীষ্ম।

মোক্ষধর্ম

এর পর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে অর্থাৎ কি করলে মানুষ দুঃখ-শোক-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবে।

ভীষ্ম বললেন : ধর্মকার্য কখনও বিফলে যায় না। সংসার অসার—এই জ্ঞান হলে মানুষের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তখন সে মোক্ষলাভ করে। সংসার যে অসার, এ কথা বুদ্ধিমান্ লোকের সর্বদা মনে রাখা উচিত,—মনে রাখা উচিত : সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, যাই আসুক, অবিচলিত চিত্তে তাকে মেনে নিতে হবে।

এই বলে অজগরব্রতের কথা বললেন ভীষ্ম। সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ও অবিচলিত থাকার নামই হল অজগরব্রত। জন্ম থেকে মানুষ যে সুখদুঃখ ভোগ করে, তা যদি সে দৈবকৃত বলে মনে করে, তবে সে আনন্দিতও হয় না, দুঃখিতও হয় না।

অজগরব্রতী এক ব্রাহ্মণের কাহিনী শোনালেন ভীষ্ম। ঐ ব্রাহ্মণ দানবরাজ প্রহ্লাদকে বলেছিলেন : "প্রহ্লাদ, অজ্ঞাত কারণ

থেকে জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। সকল জীবই মরণশীল। আকাশের জ্যোতিষ্কদেরও পতন হয়। জন্ম হলে মৃত্যু হবেই, সৃষ্টি হলেই হবে ধ্বংস। এ কথা বুঝেছি বলেই আমি মৃত্যুকে ভয় করি না—শোক করি না তার জন্য।"

তারপর ব্রাহ্মণ বললেন: "এজন্যই আমি সর্বদা সুখী- সব অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকি। এজন্যই পেলে আমি পেট ভরে উৎকৃষ্ট খাদ্য খাই, না পেলে উপবাসে থাকি; জুটলে আমি পালঙ্কে শুই, মহামূল্য বসনভূষণ পরি, নচেৎ ভূমিশয্যা ও কৌপীন আমার অবলম্বন হয়। অজগর সাপ যেমন স্থাণুর মত পড়ে থাকে এবং ভাগ্যক্রমে পাওয়া খাদ্যেই সন্তুষ্ট থাকে, আমিও তেমনি থাকি। অজগরব্রতীই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখী।"

ভীষ্ম তারপর সৃষ্টিতত্ত্ব সদাচার প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক উপদেশ দিলেন যুধিষ্ঠিরকে।

তিনি বললেন: স্রষ্টার আদিও নেই, অন্তও নেই—তিনি অনাদি অজর অমর অব্যক্ত শাশ্বত অক্ষয় অব্যয়: তাঁর থেকেই সর্ব জীবের সৃষ্টি এবং তাঁতেই সর্ব জীব লীন হবে। জীবের বিনাশ নেই, দেহ নষ্ট হলে জীব দেহান্তরে যায়।

সদাচার সম্বন্ধে তিনি বললেন: সদাচার সাধুর লক্ষণ—অসাধুরা দুরাচার।

দণ্ডদান সম্বন্ধে ভীষ্ম বললেন: যদি অহিংস উপায়ে অসাধুকে শাসন করা অসম্ভব হয়, তাহলে অবশ্যই তাকে শাস্তি দিতে হবে; নিতান্ত প্রয়োজন হলে তাকে প্রাণদণ্ডও দিতে হবে, তবে ন্যায়বিচার করে। কিন্তু ভয় দেখিয়ে শাসন করা সম্ভব হলে,

প্রাণবধ করা অত্যন্ত গর্হিত। দণ্ডদানকার্য নিরপেক্ষভাবে করতে হবে—নিজের বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনকেও অব্যাহতি দেওয়া চলবে না।

ভীষ্ম আরও বললেন: রাজা সদাচারী হলে, প্রজাও তেমনি হয়। শ্রেষ্ঠ লোকে যেমন আচরণ করেন, জনসাধারণ তেমনি করে। যে রাজা নিজেকে সংযত না করে অন্যকে শাসন করতে যান, লোকে তাঁকে উপহাস করে।

ভীষ্ম বললেন যে, ঐশ্বর্য দোষের নয়, কিন্তু আসক্তিশূন্য হয়ে ঐশ্বর্য ভোগ করতে হবে, তবেই মোক্ষলাভ হবে।

এমনি নানা উপদেশ দিয়ে নানা কাহিনী ও উপাখ্যান শুনিয়ে যুধিষ্ঠিরের সন্তপ্ত হৃদয় অনেকটা শান্ত করলেন মহামতি ভীষ্ম।

অনুশাসনপর্ব

কর্মফল

যুধিষ্ঠির বললেন : "পিতামহ, আপনি অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিলেন, তবু মনে শান্তি পাচ্ছি না আমি। জ্ঞাতিবধের ফলে আমার যে সন্তাপ উপস্থিত হয়েছে, তাতে অন্তর পুড়ে যাচ্ছে আমার।"

ভীষ্ম বললেন : 'মানুষের আত্মা বিধাতার ইচ্ছায় চলে ; সুতরাং সে কোন পাপপুণ্যের কারণ হতে পারে না। মানুষ জীবনে যে সব কাজ করে, সে সবের প্রকৃত কাবণ বা উদ্দেশ্য পর্যন্ত সে জানে না। আমি একটি প্রাচীন কাহিনী বলছি, শোন।"

ভীষ্ম বললেন : গৌতমী নামে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। তাঁব ছেলেটি সর্পদংশনে মারা যায়। অর্জুনক নামে এক ব্যাধ সেই সাপটিকে খাঁচায় আটকে গৌতমীর কাছে এনে বলল : "ভগবতী, এই হতভাগা সাপই আপনার ছেলেকে মেরেছে। বলুন, এটাকে কি করে বধ করব—আগুনে পোড়াব, না টুকরো-টুকরো করে কাটব ?"

গৌতমী বললেন : "অর্জুনক, তুমি নির্বোধ। সাপটাকে ছেড়ে দাও। ওকে মারলে আমাব ছেলে বেঁচে উঠবে না, বরং জীবন্ত প্রাণীকে হত্যা করার অপরাধে অনন্ত নরকে যেতে হবে আমাদের। এখনি ছেড়ে দাও ওকে।"

ব্যাধ বলল : "আপনার ও কথা সুস্থ মানুষের মুখে মানায়—ওতে শোকার্ত সান্ত্বনা পায় না। আপনি এই সর্পকে বধ করে শোকমুক্ত হন।"

গৌতমী বললেন : "আমি ধর্মপালন করে চলি, তাই কোন

শোক হয় না আমার। নিয়তির বশেই আমার ছেলে প্রাণত্যাগ করেছে। সুতরাং, সাপকে বধ করতে পারি না আমি। ওকে তুমি ছেড়ে দাও।"

ব্যাধ তবুও সাপটাকে বধ করাব অনুমতির জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল গৌতমীকে, কিন্তু তিনি কিছুতেই সে অনুমতি দিতে সম্মত হলেন না।

এই সময়ে সাপটি মৃদুস্বরে মনুষ্যভাষায় ব্যাধকে বলল: "মূর্খ ব্যাধ, আমাকে বধ করার জন্য জিদ ধরেছ কেন? আমাব কি দোষ? আমি ত আর ইচ্ছা করে দংশন করিনি এই বালককে,—মৃত্যু আমাকে পাঠিয়েছে বলেই না দংশন করেছি আমি। সুতরাং, এ বালকের জীবননাশের জন্য দায়ী আমি নই—দায়ী মৃত্যু "

ব্যাধ বলল: "স্বীকার করি, অন্যের বশবর্তী হয়ে দংশন করেছ তুমি, তবু তুমিই এই পাপকার্যের কারণ, তাই বধযোগ্য।"

সাপ বলল: "কারণ কেবল আমিই নই—বহু কারণের যোগাযোগে মৃত্যু ঘটেছে এই বালকের।"

ব্যাধ বলল: "তুমি এর মৃত্যুর প্রধান কারণ, সুতরাং তুমি বধযোগ্য।"

তখন স্বয়ং মৃত্যু এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। তিনি বললেন: কালের নির্দেশে আমি সর্পকে প্রেরণ করেছিলাম বালকটিকে দংশন কবতে। সুতরাং, আমি বা সর্প বালকের মৃত্যুর কারণ নই,—প্রকৃত কারণ হলেন কাল। জগতে স্থাবর জঙ্গম সূর্য চন্দ্র জল বায়ু অগ্নি সমস্তই কালের অধীন।"

এমন সময়ে কাল আবির্ভূত হলেন সেখানে। তিনি বললেন: "আমিও এই বালকের মৃত্যুর জন্য দায়ী নই। নিজের কর্মফলেই এই বালক প্রাণ হারিয়েছে। কুম্ভকার যেমন মাটির তাল দিয়ে

নিজের ইচ্ছামত জিনিসপত্র গড়ে, মানুষও তেমনি নিজের কর্মফল পায়। এই শিশু নিজেই নিজের বিনাশের কারণ।"

গৌতমী তখন বললেন : "যথার্থ কথাই বলেছেন কাল। এই বালকের মৃত্যুর জন্য দায়ী এ নিজেই—অন্য কেউ নয়। নিজ কর্মফলেই এ মরেছে। অর্জুনক, সর্পটিকে ছেড়ে দাও তুমি।"

ব্যাধ তখন সর্পকে ছেড়ে দিল, কাল ও মৃত্যু অন্তর্হিত হলেন, গৌতমী শান্তি পেলেন।

কাহিনীটি শেষ করে ভীষ্ম বললেন যুধিষ্ঠিরকে : "যুদ্ধে যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁরা নিজ নিজ কর্মফলেই নিহত হয়েছেন। এর জন্য তুমিও দায়ী নও, দুর্যোধনও দায়ী নন। তুমি শোক ত্যাগ কর, যুধিষ্ঠির।"

ভীষ্মের দেহত্যাগ

এর পর যতদিন জীবিত ছিলেন ভীষ্ম, ততদিন ধরে তিনি নিত্য নানা উপদেশ দিতে লাগলেন যুধিষ্ঠিরকে। কত বিচিত্র কাহিনী আর উপাখ্যান তিনি শোনালেন, কত জ্ঞানগর্ভ কথা বললেন!

অতিথি গৃহস্থের পরম দেবতা। অতিথি তুষ্ট হলে শত যজ্ঞফলেরও অধিক পুণ্যলাভ হয় গৃহস্থের। এই পুণ্যবলেই পুরাকালে সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন সুদর্শন এবং ওঘবতী। সে কাহিনী যুধিষ্ঠিরকে শোনালেন ভীষ্ম।

দয়া ও ভক্তের মহিমাও বর্ণনা করলেন ভীষ্ম। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি উপাখ্যান বললেন।

কাশীর অরণ্যে বিশাল এক বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষের কোটরে বাস করত এক শুকপক্ষী। একদিন এক ব্যাধ মৃগশিকারের জন্য

বিষমাখা বাণ নিয়ে এল সেই অরণ্যে। তার একটি বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেই বৃক্ষে বিদ্ধ হল। ফলে, বিষের প্রভাবে বৃক্ষটি ফলপত্রহীন হয়ে শুকিয়ে গেল।

সমস্ত পাখি তখন সেই গাছটি ছেড়ে অন্য গাছে আশ্রয় নিল। কিন্তু গেল না কেবল সেই শুকপক্ষী—এই দীর্ঘকাল ধরে সে যে বৃক্ষের কোটরে আশ্রয় পেয়েছে, যার ফল খেয়ে প্রাণধারণ করেছে, যার পত্রপল্লব তাকে রক্ষা করেছে শীতাতপ থেকে, সেই বৃক্ষকে এই দুঃসময়ে ছেড়ে যেতে মন সরল না তার। সে সেই বৃক্ষকোটরেই রইল। এবং, যেহেতু বৃক্ষটি বিষের দাহে ফলশূন্য হয়ে গিয়েছিল, সেই হেতু শুকও দিনের পর দিন অনাহারে থাকার ফলে মৃতপ্রায় হয়ে উঠল। তখন দেবরাজ ইন্দ্র এসে শুককে অন্যত্র যাবার পরামর্শ দিলেন।

শুক বলল: "আশ্রয়দাতার এই অসময়ে আমি তাকে ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারি না; তাতে অধর্ম হবে আমার।"

শুকের এ কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন ইন্দ্র। তিনি গাছটিকে আবার বাঁচিয়ে দিলেন।

ভীষ্ম বললেন: "বৃক্ষটি যেমন শুককে আশ্রয় দিয়ে পুনর্জীবন লাভ করেছিল, লোকেও তেমনি প্রকৃত ভক্তজনকে আশ্রয় দিলে সর্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে।"

দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে ভীষ্ম বললেন: "পুরুষকার অবলম্বন করে কর্ম করতে হবে মানুষকে, তাহলে দৈবও মানুষের সহায়ক হয়, কিন্তু কেবল দৈবের উপর ভরসা করে থাকলে কিছুই মেলে না। পুণ্যকর্মদ্বারা দৈবকেও জয় করা যায়।"

তারপর ভীষ্ম বললেন: যজ্ঞানুষ্ঠান বা উৎসব করা রাজাদের উচিত, কিন্তু তা প্রজাপীড়ন করে নয়। যে রাজ্যে ছোট ছেলেমেয়েরা স্বাদু খাদ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু খেতে পায় না, যে রাজ্যে প্রজারা ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে পড়ে, সে রাজ্যের রাজাকে ধিক্। যে রাজা প্রজাদের রক্ষা করতে পারেন না অথচ বলে-ছলে তাদের ধন লুণ্ঠন করেন, সে রাজাকে প্রজারা যেন মিলিত হয়ে বধ করে। যে রাজা প্রজাদের আশ্বাস দিয়ে তা রক্ষা করেন না, সে রাজাকে পাগলা কুকুরের মত হত্যা করা উচিত।

সদাচার ও ভ্রাতার কর্তব্য সম্বন্ধেও যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন ভীষ্ম।

তিনি বললেন: যারা দুরাচার, তারা দীর্ঘায়ুঃ হতে পারে না। সদাচারই ঐশ্বর্য কীর্তি আয়ুঃ ও ধর্মের সোপান।

ভ্রাতার কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি বললেন: "গুরু শিষ্যকে যেমন স্নেহ করেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও তেমনি স্নেহ করবেন কনিষ্ঠকে। শত্রুরা যাতে ভ্রাতাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি না করতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকবেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি যেন না পৈতৃক ধনসম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করেন কনিষ্ঠদের। কনিষ্ঠ যদি দুষ্কর্ম করে, তবে তার যাতে মঙ্গল হয়, সে চেষ্টা করতে হবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৎ বা অসৎ যাই হন, তাঁকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় কনিষ্ঠের। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতৃস্থানীয় এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া মাতৃস্থানীয়া।"

ধর্মাধর্ম পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে ভীষ্ম বললেন : "যে ব্যক্তি জন্মাবধি সাধ্যমত ধর্মাচরণ করে, সে নিত্য সুখী হয়। যে অধার্মিক, সে অধোগতি লাভ করে।"

তিনি বললেন : "যে ব্যক্তি ধর্ম ও অধর্ম দুই প্রকার আচরণই করে, সুখের পর দুঃখ ভোগ করে সে। যে ব্যক্তি মোহবশে অধর্ম করে পরে অনুতপ্ত হয়, তার পাপ দূর হয়ে যায়। যার মনে যত অনুতাপ জাগে, ততই পাপক্ষয় হয় তার।"

অহিংসা সম্বন্ধে ভীষ্ম বললেন : "অহিংসাই ধর্মসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। যিনি সর্বজীবকে নিজের তুল্য জ্ঞান করেন, ক্রোধ ও জিঘাংসা যিনি ত্যাগ করতে পেরেছেন, পরলোকে তিনি সুখলাভ করবেন।"

এমনি উপদেশ দিয়ে দিয়ে যুধিষ্ঠিরের মনস্তাপ দূর করলেন ভীষ্ম। এদিকে সূর্যেরও উত্তরায়ণ আরম্ভ হল। তখন এক শুভদিনে দেহত্যাগ করার সঙ্কল্প নিয়ে সমাধিস্থ হলেন ভীষ্ম। অল্পক্ষণ পরেই তাঁর দেহ থেকে প্রাণবায়ু বহির্গত হল।

এমনি করে প্রায় দু মাস ধরে অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে শরশয্যায় শুয়ে থাকার পর নিজের ইচ্ছায় প্রাণত্যাগ করলেন পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সত্যসন্ধ চিরকুমার ভীষ্ম। স্বর্গ থেকে এসেছিলেন দ্যু বসু ভীষ্মরূপে কুরুবংশের মহিমা বাড়াতে, সে কাজ সমাধা করে আবার স্বর্গে ফিরে গেলেন তিনি।

শোক-ভারাক্রান্ত চিত্তে পাণ্ডবেরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করলেন মহামতি পিতামহের।

আশ্বমেধিকপর্ব

অশ্বমেধ-যজ্ঞ

ভীষ্মের মৃত্যুর পর আবার মনস্তাপ উপস্থিত হল যুধিষ্ঠিরের। আবার বলতে লাগলেন তিনি : "কুরুক্ষেত্রের সর্বনাশা যুদ্ধের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না আমি, জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও স্বজন-বন্ধুদের ক্ষয়ে মন আমার ভেঙে গেছে,—কিছুতেই রাজ্যশাসন করতে পারব না আমি—বনে যাব।"

কত প্রবোধ তাঁকে দিলেন শ্রীকৃষ্ণ—কত বোঝালেন তাঁকে। এমন কি, পুত্রহারা ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত নিজের শোক ভুলে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তবু শান্ত হলেন না যুধিষ্ঠির। অবশেষে মহামুনি ব্যাস তাঁকে বললেন : "মহারাজ, অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর তুমি : তাতে তোমার জ্ঞাতিবধজনিত পাপও দূর হবে, মনেও শান্তি পাবে।"

এ পরামর্শ মেনে নিলেন যুধিষ্ঠির। তখন মহাসমারোহে যজ্ঞের আয়োজন হতে লাগল।

এই সময়ে অভিমন্যুর পত্নী উত্তরা একটি পুত্র প্রসব করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অশ্বত্থামার ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রভাবে ছেলেটি মৃতাবস্থায় প্রসূত হল। আবার হাহাকার পড়ে গেল পাণ্ডবদের ভবনে ভবনে, হস্তিনাপুরের প্রজাদের ঘরে ঘরে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যে সব পাণ্ডব নারী গর্ভবতী ছিলেন, তাঁরা সকলেই দুর্মতি অশ্বত্থামার অস্ত্র-প্রভাবে মৃতসন্তান প্রসব করেছিলেন। একমাত্র বাকী ছিলেন উত্তরা। তাঁরও ত ঐ দশা! তবে কি নির্বংশ হবেন পাণ্ডবেরা— হস্তিনার সিংহাসনে কি আর বসবেন না কোন কুরুবংশধর?

কিন্তু অশ্বত্থামাকে বলেছিলেন কৃষ্ণ : "উত্তরার সন্তানকে বাঁচাব

আমি। কৃপাচার্যের কাছে শিক্ষা পেয়ে ষাট বছর ধরে কুরুরাজ্য শাসন করবে সে।"

কৃষ্ণ তাঁর কথা রাখলেন। তিনি পুনর্জীবিত করলেন উত্তরার সদ্যোজাত মৃত সন্তানটিকে। ছেলেটির নাম রাখা হল : পরীক্ষিৎ।

তখন মহানন্দে মেতে উঠল হস্তিনাপুর, আর সেই আনন্দোৎসবের মধ্যে প্রস্তুতি চলতে লাগল অশ্বমেধ-যজ্ঞের।

অশ্বমেধ-যজ্ঞের নিয়ম হল : একটি সুলক্ষণ ঘোড়া বেছে নিয়ে শাস্ত্রসম্মতভাবে উৎসর্গ করতে হবে তাকে। তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ঘোড়াটি তার ইচ্ছামত দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে। কেউ তাকে আটকে রাখলে যজ্ঞ পণ্ড হবে। তাই ঘোড়ার পিছনে পিছনে যাবে সশস্ত্র বাহিনী, যাতে কেউ না তাকে আটকে রাখতে পারে। এমনি ভাবে এক বছর ধরে ঘোরানর পর ঘোড়াটিকে ফিরিয়ে আনতে হবে আপন রাজ্যে। তখন যজ্ঞের আয়োজন হবে, আর সেই যজ্ঞে বলি দিতে হবে ঘোড়াটিকে।

চৈত্রপূর্ণিমা। শাস্ত্রবিধানানুযায়ী যজ্ঞাশ্ব ছেড়ে দেওয়া হল। তাকে রক্ষা করার জন্য অর্জুন সসৈন্যে তার পিছন পিছন গেলেন। নানা দেশ ঘুরে, বহু রাজরাজড়াকে পরাস্ত করে, অবশেষে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন মণিপুরে।

মণিপুরের রাজা বভ্রুবাহন অর্জুনেরই পুত্র। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপনের পর অর্জুন একবার দেশভ্রমণে বের হন। ঘুরতে ঘুরতে মণিপুরে উপস্থিত হন তিনি। সেখানে মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। চিত্রাঙ্গদা তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান, তাই মণিপুররাজ চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুনের সঙ্গে আসতে দেন না। বভ্রুবাহন চিত্রাঙ্গদার একমাত্র সন্তান, দাদামশায়ের মৃত্যুর পর তিনিই রাজা হয়েছেন মণিপুরের।

পিতা এসেছেন শুনে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য মহাসমারোহে মণিপুররাজ বভ্রুবাহন রাজপুরী থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বভ্রুর,—তাঁর এ আচরণে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন অর্জুন। পুত্রকে তিরস্কার করে বললেন তিনি ঃ "তুমি না ক্ষত্রিয়? এ কি আচরণ তোমার? মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে এসেছি আমি। কোথায় তুমি বীরের মত সে ঘোড়া আটকে রাখার চেষ্টা করবে, না এসেছ সবিনয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করতে! ক্ষত্রকুলাঙ্গার, সাহস থাকে ত ধর ঘোড়া—যুদ্ধ কর আমার সঙ্গে।"

এ কথা শুনে মর্মাহত হলেন বভ্রুবাহন।

এমন সময়ে সেখানে উপস্থিত হলেন নাগকন্যা উলুপী। এঁকেও অর্জুন একদা বিবাহ করেছিলেন। উলুপী তাই হলেন বভ্রুর বিমাতা। অর্জুনের তিরস্কার শুনে তিনি সপত্নী-পুত্রকে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করলেন।

আরম্ভ হল যুদ্ধ অর্জুনে আর বভ্রুবাহনে—পিতায় আর পুত্রে। বভ্রুও মহাবীর—প্রচণ্ড বিক্রমে তিনি যুদ্ধ করতে লাগলেন তাঁর দিগ্বিজয়ী পিতার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত অঘটন ঘটল বভ্রুর শরাঘাতে প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন অর্জুন। পিতার এ অবস্থা দেখে বভ্রুও হতচেতন হয়ে পড়লেন।

সংবাদ পেয়ে চিত্রাঙ্গদা দ্রুত রণক্ষেত্রে এলেন। পতিপুত্রের অবস্থা দেখে হাহাকার করতে লাগলেন তিনি।

কিছুক্ষণ পরে বভ্রুবাহন চেতনা ফিরে পেলেন। তখন তিনি স্থির করলেন যে, তিনিও অনশনে প্রাণত্যাগ করে পিতৃশোক ভুলবেন। এই সঙ্কল্প করে তিনি প্রায়োপবেশনে বসলেন। চিত্রাঙ্গদাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন।

মাতাপুত্রের অবস্থা দেখে অত্যন্ত দুঃখ হল উলুপীর। তিনি

তখন নাগলোক থেকে সঞ্জীবন-মণি আনিয়ে তার সাহায্যে পুনর্জীবিত করলেন অর্জুনকে। এবার অর্জুন সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন পুত্র বভ্রুবাহনকে। পিতাপুত্রে মিলন হল।

এমনি করে এক বছর ধরে রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে রাজাদের পরাজিত করে অশ্বমেধ-যজ্ঞের উৎসর্গীকৃত অশ্বকে হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনলেন অর্জুন। তখন মহাসমারোহে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করলেন যুধিষ্ঠির। দূর হল তাঁর মনস্তাপ।

শক্তুদাতা ব্রাহ্মণের কাহিনী

অশ্বমেধ-যজ্ঞ শেষ হয়েছে। দূর হয়েছে যুধিষ্ঠিরের মনস্তাপ। যজ্ঞ-উপলক্ষে প্রচুর দান করেছেন তিনি। তাতে তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়েছে দেশে দেশে। প্রশান্ত মনে আত্মীয়-স্বজন পাত্রমিত্র নিয়ে যজ্ঞস্থলে বসে আছেন ধর্মরাজ।

এমন সময়ে অপূর্ব এক নকুল এসে উপস্থিত হল সেখানে। সাধারণ বেঁজির চেয়ে অনেক বড় এর আকার, চোখ দুটি এর গভীর নীল, দেহের একটি পাশ সোনালী। তাকে দেখে উপস্থিত সকলে চমৎকৃত হল।

নকুলটি এসেই কিছু সময় ধরে গড়াগড়ি দিল যজ্ঞস্থলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলল সে: "শুনতে পাচ্ছি: এ যজ্ঞে রাজা যুধিষ্ঠির যেমন দান করেছেন, তেমনি নাকি আর কেউ কখনও করেননি; লোকে বলছে: যুধিষ্ঠিরই নাকি শ্রেষ্ঠ দাতা। কিন্তু এ কথা মিথ্যা।"

সবাই অবাক্ হল, নকুলকে জিজ্ঞাসা করল: "তুমি কি সত্যই

বেঁজি না ছদ্মবেশী কেউ? কোথা থেকে এসেছ তুমি? কেন নিন্দা করছ এ যজ্ঞের?"

নকুল মৃদু হেসে বলল: "দাতা যদি বলতে হয়, তবে কুরুক্ষেত্র-বাসী এক ব্রাহ্মণকেই বলব। ছাতু দান করেছিল সে।"

সভাজনরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল: "ছাতু দান করে দাতা! সে কেমন?"

নকুল বলতে লাগল: "কুরুক্ষেত্রে বাস কবতেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন উঞ্ছজীবী—কৃষকেব ফসল কেটে নেওয়ার পর খেতে যে সব শস্যকণা পড়ে থাকত, তাই সংগ্রহ কবেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।"

সভাজনদের কেউ কেউ বিদ্রূপ করে চাপা গলায় বললেন: "এমন ব্রাহ্মণও কিনা যুধিষ্ঠিরের চেয়ে বড় দাতা—চামচিকা হল বড় বাজের চেয়ে!"

নকুল এ মন্তব্য শুনেও কোন প্রতিবাদ করল না। সে বলতে লাগল: "একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হল দেশে। সেবার ফসল বড় ফলল না। ফলে, দারুণ কষ্টে পড়লেন ব্রাহ্মণ। প্রায়ই তাঁর সপরিবারে উপবাসে কাটে। একবার তিনি ও তাঁর পরিবারের সকলে কদিন ধরে উপবাসে কাটালেন। তারপর ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে কিছু যব যোগাড় করে তা দিয়ে ছাতু তৈরী করলেন। সেই ছাতু তিনি সপরিবারে খাবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময়ে—"

এই বলে একটু থেমে আবার বলতে লাগল নকুল: "এমন সময়ে এক ক্ষুধার্ত অতিথি এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। ব্রাহ্মণ তাঁর নিজের ভাগ অতিথিকে ধরে দিলেন, কিন্তু তা খেয়েও ক্ষুধা মিটল না অতিথির। তা দেখে ব্রাহ্মণের পত্নী স্বামীকে বললেন: 'তুমি আমার ভাগ অতিথিকে দাও'।

"ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীর দিকে তাকালেন। ক্রমাগত অনাহারে থেকে থেকে এই বৃদ্ধার দেহ ভেঙে পড়েছে—পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে। ব্রাহ্মণের চোখে জল এল। তিনি বললেন: 'ব্রাহ্মণী, আমি কোন্ মুখে তোমার ভাগ নেব? কীটপতঙ্গও নিজের নিজের ভার্যাকে প্রতিপালন করে। কিন্তু আমি তোমাকে পেট পুরে খেতেও দিতে পারি না। এই বৃদ্ধ বয়সে না খেয়ে খেয়ে তুমি মরতে বসেছ। এ অবস্থায় তোমার ভাগ নিতে পারি না আমি।'

"ব্রাহ্মণের এ কথায় কর্ণপাত করলেন না ব্রাহ্মণী—তিনি আপন ভাগ ধরে দিলেন অতিথিকে। কিন্তু সে ভাগ খেয়েও পেট ভরল না ক্ষুধার্ত অতিথির।

"তখন ব্রাহ্মণের পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁদের ভাগ অতিথিকে দিতে উদ্যত হলেন। ব্রাহ্মণ অনেক আপত্তি করলেন, কিন্তু কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারলেন না তাঁদের—তাঁরাও নিজেদের ভাগ অতিথিকে দিলেন।

"উঞ্ছজীবী এই ব্রাহ্মণের ও তাঁর পরিজনদের অতিথিসেবা ও দানধর্ম দেখে বিস্মিত হলেন সেই অতিথি। তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং ছদ্মবেশী ধর্ম। ব্রাহ্মণকে তিনি বললেন: 'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তোমার এ দানের তুলনা নেই। তোমার এ শক্তুদান শত অশ্বমেধের পুণ্যের চেয়েও মূল্যবান্।' এই বলে তিনি ব্রাহ্মণকে সপরিবারে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে গেলেন।"

কাহিনীটি শুনে সভাজনেরা নির্বাক্ হয়ে রইলেন। নকুলও ক্ষণকাল নীরবে কি যেন চিন্তা করল, তারপর বলল: "ব্রাহ্মণ স্বর্গে যাওয়ার পরে আমি আমার গর্ত থেকে বেরিয়ে সেখানে গড়াগড়ি খেলাম। অল্প কয়েকটি ছাতুর কণা সেখানে পড়েছিল; গড়াগড়ি খাওয়ার সময়ে সেগুলি আমার দেহের এক পাশে লাগল, সঙ্গে

সঙ্গে দেহের সে পাশটি স্বর্ণময় হয়ে গেল। তারপর থেকে কত তপোবনে কত যজ্ঞস্থলে কতই না গড়াগড়ি খাচ্ছি, কিন্তু কই, দেহের অন্য পাশটি ত স্বর্ণময় হচ্ছে না! তাই বলছিলাম ঃ সেই উঞ্ছজীবী ব্রাহ্মণের দানের অতিথিসেবার তপস্যার তুলনা নেই।"

এই বলে নকুল চলে গেল। উপস্থিত সকলে স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবতে লাগলেন, তাইত!

আশ্রমবাসিকপর্ব

ধৃতরাষ্ট্রাদির বানপ্রস্থ অবলম্বন

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধজয়ের পর পনর বছর কাটল। যুধিষ্ঠিরের সুশাসনে সুখে আছে সবাই। সবচেয়ে সুখে আছেন ধৃতরাষ্ট্র। তাঁর সম্মতি না নিয়ে কোন কাজ করেন না যধিষ্ঠির। যাতে পুত্রশোকাচ্ছন্ন বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাত কোনরূপ মনঃকষ্ট না পান, সেদিকে যুধিষ্ঠিবেব সদা সতর্ক দৃষ্টি। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি পিতার অধিক যত্ন কবেন, কুন্তীব চেয়েও গান্ধারীর প্রতি তাঁর মনোযোগ বেশী। সবাইকে ডেকে তিনি বলে দিয়েছেন: "বৃদ্ধ কুরুবাজ আমাদের সকলেরই মাননীয়। যিনি তাঁর আজ্ঞা পালন করবেন না, তিনি আমাদের শত্রু।"

এ কথা পাণ্ডবেরা সকলেই শুনতেন, কেবল ভীম ছাড়া। তিনি প্রায়ই গোপনে গোপনে ধৃতরাষ্ট্রেব অপ্রিয় কাজ করতেন। একদিন তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে জাঁক করে বললেন: "আমার এই মুগুরের মত বাহু দুখানির প্রতাপেই মূঢ় দুর্যোধন স্বজন-বান্ধবসহ যমালয়ে গেছে।"

এ কথা কানে গেল ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর। বুদ্ধিমতা গান্ধারী চুপ করে রইলেন, তিনি বুঝলেন: কালের ধর্মই এই—আজ যে প্রবলপ্রতাপ রাজা, কাল তাকে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে পরমুখাপেক্ষী হতে হবে।

ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু ধৈর্য ধরতে পারলেন না—অধীর হয়ে পড়লেন মনোব্যথায়। তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে ভীমের কথা কিছু না জানিয়ে বললেন: "বৎস যুধিষ্ঠির, তোমার আশ্রয়ে পরম সুখে আছি আমি, দানধ্যান করে পুণ্যসঞ্চয়ও করেছি। পুত্রহীনা গান্ধারীও

শোককে জয় করতে পেরেছেন। আমার নৃশংস পুত্রেরা—যারা দ্রৌপদীকে অপমান এবং তোমাদের সম্পদ্ হরণ করেছিল,—"

ঈষৎ লজ্জিত ঈষৎ ব্যথিত হয়ে যুধিষ্ঠির বাধা দিলেন : "তাঁদের কথা আর তুলবেন না, জ্যেষ্ঠতাত। ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধে নিহত হয়ে স্বর্গে গেছেন তাঁরা।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, : "হাঁ, উচিত গতিই লাভ করেছে তারা। এখন তোমরাই আমার পুত্র। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রকে রাজ্য দিয়ে বনে বাস করাই আমার কুলধর্ম। আমিও তাই গান্ধারীকে নিয়ে বনবাসী হতে চাই। তুমি অনুমতি দাও, যুধিষ্ঠির, আমরা বনবাসে যাই। বনে আমি তপস্যা করব, তুমিও পাবে সে তপস্যার ফল।"

ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাবে মর্মাহত হলেন যুধিষ্ঠির। তিনি বললেন : "বালক-বয়স থেকেই আমরা পিতৃহারা। আপনিই আমাদের পিতা ও পরম গুরু। আপনি বনে গেলে, রাজ্যভোগে কি প্রয়োজন আমার? আমাকে ধিক্, আমি অতি দুর্বুদ্ধি ও রাজ্যলোভী!"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে যুধিষ্ঠির আবার বললেন : "জ্যেষ্ঠতাত, আপনি আপনার পুত্র যুযুৎসুকে বা অন্য কাউকে এ রাজ্য দিন, অথবা নিজেই শাসন করুন, আমিই বনে যাব। আমি এ রাজ্যের রাজা নই, রাজা আপনিই। দুর্যোধনাদির কাজের জন্য কিছুমাত্র দুঃখ নেই আমার মনে, বরং তাঁদের মৃত্যুর জন্য সর্বদা সন্তাপ ভোগ করছি। মাতা গান্ধারী ও জননী কুন্তীকে আমি সমান জ্ঞান করি। করজোড়ে আপনাকে মিনতি করছি, জ্যেষ্ঠতাত, আমাকে দুঃখ দেবেন না।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন : "আমাকে ভুল বুঝে মিথ্যা দুঃখ পেয়ো না, যুধিষ্ঠির,—শাস্ত্রনির্দিষ্ট তপশ্চর্যার উদ্দেশ্যেই বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে চাই আমি।"

যুধিষ্ঠির তবু অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন ধৃতরাষ্ট্রকে যাতে তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বনের বাসনা ত্যাগ করেন।

এমন সময়ে মহামুনি ব্যাস এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। তিনি বললেন ঃ "অন্ধরাজের সঙ্কল্পে বাধা দিয়ো না, যুধিষ্ঠির। যুদ্ধে অথবা বনবাসে প্রাণত্যাগ করাই রাজর্ষিদের ধর্ম। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী বৃদ্ধ হয়েছেন, বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই তাঁদের উচিত।"

অবশেষে সম্মতি দিলেন যুধিষ্ঠির। বনযাত্রার প্রাক্কালে ধৃতরাষ্ট্র প্রজাদের ও অনুগত রাজাদের ডেকে বললেন ঃ "আপনাদের সঙ্গে ভরতবংশের চিরদিনই প্রীতির সম্পর্ক। মহারাজ শান্তনুর পরে মহামতি ভীষ্মের উপদেশমত এই রাজ্য শাসন করেছেন বিচিত্রবীর্য ও পাণ্ডু। তারপর আমিও সেবা করেছি আপনাদের। আমার যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে, তবে তা আপনারা নিজগুণে মার্জনা করবেন।"

এই বলে দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে তিনি আবার বলতে লাগলেন ঃ "মন্দ-বুদ্ধি দুর্যোধন পাণ্ডবদের প্রতি অনেক অত্যাচার করেছে, তার জন্য আমি মর্মাহত; কিন্তু সে আপনাদের কাছে কখনও কোন অপরাধ করেনি। তার দুর্নীতির ফলে এবং আমার দোষে পৃথিবী প্রায় নিঃক্ষত্রিয় হয়েছে। এ অপরাধের জন্য কৃতাঞ্জলি হয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনারা ক্ষমা করুন আমাকে— প্রসন্ন হয়ে আমাকে ও গান্ধারীকে বনগমনের অনুমতি দিন।"

সর্বশেষে তিনি বললেন ঃ "লোকপালতুল্য চার ভ্রাতা যাঁর সচিব, ব্রহ্মার ন্যায় মহাতেজা সেই যুধিষ্ঠির আপনাদের পালন করবেন। সম্পদে বিপদে আপনারা তাঁর প্রতি সমদৃষ্টি রাখবেন। গচ্ছিত ধনের মত তাঁকে আমি আপনাদের হাতে দিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের সকলকেও তাঁর হাতে দিচ্ছি। আমি আবার

আপনাদের মিনতি করছি: আমার দুর্মতি পুত্রদের আপনারা ক্ষমা করুন।"

ধৃতরাষ্ট্রের অনুনয় শুনে প্রজাদের চোখে জল এল, তাদের কণ্ঠরোধ হল।

এর পর কার্তিকী পূর্ণিমায় গান্ধারীকে সঙ্গে নিয়ে বনযাত্রা করলেন ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর এবং সঞ্জয়ও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। আর গেলেন মা-কুন্তী। পাণ্ডবেরা তাঁকে বাধা দেবার জন্য কত চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন না। ধৃতরাষ্ট্র নিজেও তাঁকে বোঝালেন, কিন্তু মা-কুন্তী দৃঢ় কণ্ঠে বললেন: "আমি বনে বাস করব—তপস্বিনী গান্ধারী ও কুরুরাজের সেবা করব।"

বনে গিয়ে কঠোর তপস্যায় রত হলেন ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী বিদুর আর সঞ্জয়।

কুরুবৃদ্ধ ও কুরুবৃদ্ধাদের দেহত্যাগ

কুন্তী বনে গেলে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন পাণ্ডবেরা। কদিন পরে তাঁরা দ্রৌপদীকে নিয়ে বনে গেলেন কুন্তী গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করার জন্য। রাজপুরীর নারীরা এবং বহু নাগরিকও তাঁদের সঙ্গে চললেন।

বনে ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমের কাছে এসে পাণ্ডবেরা যানবাহন থেকে নেমে পদব্রজে অগ্রসর হলেন। কিছু দূরে গিয়ে বনবাসী তাপসদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। তাপসদের জিজ্ঞাসা করে যুধিষ্ঠির জানতে পারলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র যমুনায় স্নান করে জল ও ফুল আনতে গেছেন; গান্ধারী এবং কুন্তীও তাঁর সঙ্গে গেছেন।



এ কথা শুনে পাণ্ডবেরা যমুনার দিকে গেলেন। পথিমধ্যে তাঁদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর দেখা হল—ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে পথ দেখিয়ে আনছিলেন কুন্তী। পাণ্ডবেরা কাঁদতে কাঁদতে প্রণাম করলেন, তারপর তাঁদের জলপূর্ণ কলস নিজেরা বহন করে আশ্রমের দিকে ফিরে চললেন।

পঞ্চপাণ্ডবকে এবং পাণ্ডব-নারীদের দেখার জন্য বনের সমস্ত তাপস এসে উপস্থিত হলেন। তাপসেরা বিদায় নিলে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাঁর কাছে সঞ্জয় ও বিদুরের সন্ধান নিলেন যুধিষ্ঠির।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন: "বিদুর এখন কঠোর তপস্যায় নিরত হয়েছেন। বায়ু ছাড়া অন্য কিছু আহার করেন না তিনি। শরীর তাঁর শুকিয়ে দড়ির মত পাকিয়ে গেছে, সমস্ত শিরাগুলি পড়েছে বেরিয়ে। আজকাল তাঁকে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে বনের নির্জন পথে তাপসরা নাকি তাঁকে দেখতে পান।"

এমন সময়ে আশ্রম থেকে অনতিদূরে বিদুরকে দেখা গেল। তাঁর দেহ সম্পূর্ণ নগ্ন মললিপ্ত ও ধূলিধূসর। আশ্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করেই চলে যাচ্ছিলেন বিদুর, যুধিষ্ঠির দ্রুতপদে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

খানিক দূর গিয়ে নির্জনে একটি গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন বিদুর, তারপর অনিমেষনয়নে দেখতে লাগলেন যুধিষ্ঠিরকে। ঐ অবস্থাতেই দেহত্যাগ করলেন তিনি।

এর পর পাণ্ডবেরা মাসাধিক কাল ধরে বনে থেকে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীকে সেবা করতে লাগলেন।

এমন সময়ে একদিন মহামুনি ব্যাস এলেন ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে। আরও অনেক মহর্ষি সেদিন সে আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। নানা

ধর্মালোচনার পর ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন: "রাজেন্দ্র, আমি জানি, পুত্রশোকের যন্ত্রণা এখনও ভুলতে পারনি তুমি। তোমার কি কামনা বল, তপস্যাবলে আমি তা পূর্ণ করব।"

ধৃতরাষ্ট্র বললেন: "আপনাদের মত সাধুসমাগমে ধন্য হয়েছি আমি। আমার আর পরলোকের ভয় নেই। কিন্তু দুর্যোধন দুর্মতি হলেও, সেই হতভাগ্যের জন্যই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। মনে আমি শান্তি পাচ্ছি না কিছুতেই।"

এই সময়ে গান্ধারীও করজোড়ে ব্যাসকে বললেন: "আমারও অন্তর পুত্রশোকে জ্বলছে। মুনিবর, আপনি কি তপোবলে আমাদের মৃত পুত্রদের দেখাতে পারেন না? তাহলে শুধু আমি নই, এই পুত্রহারা দ্রৌপদী ও সুভদ্রা, পতিপুত্রহারা বীরপত্নীরা, পাণ্ডব-জননী কুন্তী সকলেই মনে শান্তি পাবেন।"

গান্ধারীর অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলেন ব্যাস। তিনি সকলকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাতীরে গেলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হল। মহাতেজা ব্যাসদেব ভাগীরথীর পুণ্যসলিলে স্নান করলেন, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে আহ্বান করলেন মৃত পাণ্ডব ও কৌরব বীরদের।

অমনি গঙ্গার জলে তুমুল কোলাহল শোনা গেল: আর, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ বিরাট দ্রুপদ অভিমন্যু দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ঘটোৎকচ জয়দ্রথ শতভ্রাতা দুর্যোধন প্রভৃতি কুরুক্ষেত্রে নিহত সমস্ত বীরগণ দিব্যদেহ ধারণ করে গঙ্গাগর্ভ থেকে উঠলেন। এই দৃশ্য দেখার জন্য ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু দিলেন।

সেদিন সারা রাত পতিহারা পুত্রহারা নারীগণ পরমানন্দে কাটালেন। রাত্রি শেষ হয়ে এলে মৃত বীরেরা আবার গঙ্গাগর্ভে বিলীন হলেন। তখন ব্যাসদেবের নির্দেশে বহু সাধ্বী নারী

ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে তাঁদের মৃত স্বামীদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গঙ্গাগর্ভে প্রাণবিসর্জন দিলেন।

পরদিন ধৃতরাষ্ট্রের সনির্বন্ধ অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুধিষ্ঠির সদলে হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন।

দু বছর পরে নিদারুণ এক সংবাদ এল হস্তিনাপুরে।

বনযাত্রার প্রাক্কালে ধৃতরাষ্ট্র যে যজ্ঞ করেছিলেন, সেই যজ্ঞের আগুন বনের এক নির্জন অংশে ফেলা হয়। এই তিন বছর ধরে সেই যজ্ঞাগ্নি ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে, শেষে একদিন দাবানলের সৃষ্টি হয়—সমস্ত অরণ্য অগ্নিময় হয়ে ওঠে। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তী ক্রমাগত কঠোর তপস্যার ফলে অত্যন্ত দুর্বল ও প্রায় চলৎশক্তিরহিত হয়ে পড়েছিলেন; তাঁরা সেই আগুনে প্রাণ হারিয়েছেন। সঞ্জয় কোন রকমে আত্মরক্ষা করে হিমালয়ে চলে গেছেন তপস্যা করতে।

এ সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডবেরা হাহাকার করতে লাগলেন। তারপর ভারাক্রান্ত মনে ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র যুযুৎসুকে সঙ্গে নিয়ে শ্রাদ্ধকার্যাদি সম্পাদন করলেন।

মুষলপর্ব

যাদববংশ ধ্বংস

গান্ধারী অভিশাপ দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে : কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পরে তাঁর বংশ ধ্বংস হবে। সতীর অভিশাপ ব্যর্থ হয়নি।

কৃষ্ণ ছিলেন দ্বারকাবাসী। তাঁর বংশের নাম: যাদববংশ। কৃষ্ণের মাতামহ উগ্রসেন ছিলেন দ্বারকার রাজা। অবশ্য, কৃষ্ণই ছিলেন রাজ্যের সর্বময় কর্তা।

অশ্বমেধ-যজ্ঞের পর হস্তিনাপুর থেকে দ্বারকায় ফিরলেন কৃষ্ণ এবং সেখানেই বাস করতে লাগলেন। এর ছত্রিশ বছরের মধ্যে যাদববংশীয়দের প্রভূত অধোগতি ঘটল। অত্যন্ত গর্বিত ও দুর্নীতি-পরায়ণ হয়ে উঠলেন তাঁরা।

এই সময়ে একদিন তিন মহামুনি এলেন দ্বারকায়—বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ। তাঁদের দেখে কুবুদ্ধি জাগল যাদব বীরদের। তাঁরা কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে স্ত্রীলোকের বেশে সাজিয়ে মুনিদের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন: "ইনি গর্ভবতী; আপনারা দয়া করে বলুন: ইনি কি প্রসব করবেন?"

যাদব বীরদের এই ইতর রসিকতায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন মুনিরা। তাঁরা বললেন: "হাঁ, এই কৃষ্ণপুত্র শাম্ব অবশ্যই কিছু প্রসব করবে, তবে সে বস্তুটি এক ভীষণ মুষল। ঐ মুষলই সবংশে নিধন করবে তোমাদের। তোমরা যে রকম দুর্বৃত্ত নৃশংস ও দাম্ভিক হয়ে উঠেছ, তাতে তোমাদের ঐ ভাবেই বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া উচিত।"

পরদিনই বিকট এক মুষল প্রসব করলেন শাম্ব। যাদব বীরেরা

ভীত হয়ে রাজা উগ্রসেন কৃষ্ণ ও বলরামকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। তাঁদের নির্দেশে যাদবরা মুষলটি মিহি করে গুঁড়িয়ে সেই চূর্ণ সমুদ্রে ফেলে দিলেন।

এর পর নানা দুর্লক্ষণ দেখা যেতে লাগল দ্বারকায়, নানা অমঙ্গল ঘটতে লাগল। তখন কৃষ্ণ বললেন যাদবদের: "আমাদের বিনাশ আসন্ন। তোমরা সবাই সমুদ্রতীরে প্রভাসতীর্থে যাও।"

কৃষ্ণের নির্দেশে যাদবেরা প্রভাসতীর্থে গেলেন। সেখানে প্রধান প্রধান যাদব বীরেরা কৃষ্ণের সামনেই মদ্যপান করতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে তাঁরা মাতাল হয়ে পরস্পর কলহ করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত আরম্ভ করলেন যুদ্ধ। তার ফলে যাদব বীরেরা দলে দলে মারা পড়তে লাগলেন।

এ ব্যাপার দেখে অত্যন্ত বিষাদিত হয়ে পড়লেন বলরাম, তিনি মনোদুঃখে সে স্থান ত্যাগ করে নিকটে এক বনে প্রবেশ করলেন।

আর, শ্রীকৃষ্ণ একমুষ্টি তৃণ হাতে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই তৃণগুচ্ছ বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর এক লৌহমুষলে পরিণত হল। সেই মুষলের আঘাতে তিনি উচ্ছৃঙ্খল যাদবদের বধ করতে লাগলেন।

আরও একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল এই সময়ে। সেখানে যত তৃণ ছিল, সে সমস্তই মুষল হয়ে গেল। তখন সেই মুষলগুলি নিয়ে যাদবরা পরস্পরকে নিহত করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে সমস্ত যাদব বীর বিনষ্ট হলেন—বাকী রইলেন কেবল কৃষ্ণ, বলরাম, বভ্রু নামে এক যাদব বীর, আর কৃষ্ণের সারথি দারুক।

কৃষ্ণ তখন দারুককে পাঠালেন হস্তিনায় অর্জুনকে সংবাদ দেবার জন্য, আর বভ্রুকে পাঠালেন দ্বারকায় যাদব নারীদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে। বভ্রু দ্বারকায় যাবার উপক্রম করতেই একটা মুদ্গর এসে

পড়ল তাঁর উপরে। মুদ্গরটি ছুড়েছিল এক ব্যাধ পশুহননের জন্য। বভ্রু সে মুদ্গরের আঘাতে প্রাণ হারালেন।

তখন কৃষ্ণ নিজেই গেলেন দ্বারকায়। সেখানে তাঁর পিতা বসুদেবের উপর যাদব নারীদের রক্ষার ভার দিলেন, তারপর বনের মধ্যে ফিরে এলেন বলরামের সন্ধান করতে।

বনে প্রবেশ করে কৃষ্ণ দেখলেন: একটি নির্জন গাছের নিচে বসে চিন্তা করছেন বলরাম। সহসা একটি বিরাট্‌কায় সর্প বেরিয়ে এল বলরামের মুখের ভিতর থেকে। সাপটি শ্বেতবর্ণ, সহস্রটি তার ফণা, আর মুখগুলি রক্তবর্ণ। সেই অপূর্ব মহানাগটি ধীরে ধীরে সমুদ্রে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল! বলরামের দেহ প্রাণশূন্য হল।

অগ্রজ বলরামকে এভাবে দেহত্যাগ করতে দেখে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল কৃষ্ণের মন। সেই বিজন বনে একাকী কিছুক্ষণ ধরে পায়চারি করলেন তিনি, তারপর ভূমিতে শয়ন করে যোগস্থ হলেন। দূর থেকে এক ব্যাধ তাঁকে দেখে মৃগ মনে করে শর নিক্ষেপ করল। সেই শরের আঘাতে কৃষ্ণের মহান্ জীবনের অন্ত হল।

অর্জুনের পরাজয়

দারুক এসে পৌঁছলেন হস্তিনায়। যাদব বংশনাশের সংবাদ শুনে শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল পাণ্ডবপুরী।

দারুকের সঙ্গে উদ্বিগ্নচিত্তে অবিলম্বে দ্বারকায় এসে পৌঁছলেন অর্জুন। তাঁকে দেখে হাহাকার করতে লাগলেন বসুদেব আর যাদব নারীরা; তিনিও হাহাকার করতে লাগলেন।

বসুদেব বললেন: "আমার আর বাঁচার ইচ্ছা নেই, অর্জুন; আমি পানাহার ত্যাগ করেছি।"

পরদিন প্রভাতে যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করলেন কৃষ্ণের পিতা বসুদেব। অর্জুন সাশ্রুনয়নে সমস্ত যাদব বীরের অন্তিম কার্য সম্পন্ন করলেন।

সপ্তম দিনে যাদব নারীদের সঙ্গে নিয়ে অর্জুন হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। দ্বারকার প্রজাপুঞ্জও তাঁর সঙ্গে চলল। সবাইকে নিয়ে অর্জুন দ্বারকা ত্যাগ করতে না করতেই নগরীটি সমুদ্রজলে প্লাবিত হয়ে গেল।

বিপর্যয়ের অবসান হয়নি তখনও। পথিমধ্যে আভীর দস্যুরা অর্জুনকে আক্রমণ করল।

ত্রিভুবনজয়ী বীর অর্জুন, তাঁর সঙ্গেও বহু যোদ্ধা, তবু তিনি নগণ্য আভীর দস্যুদের হাতে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত হলেন! দস্যুরা যাদব নারীদের হরণ করে নিয়ে গেল। বিশ্বজয়ী অর্জুন মূঢ়ের মত হতবাক্ হয়ে রইলেন।

অতি অল্প কয়েকজন যাদবনারী কোনমতে আভীরদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন ; আর রক্ষা পেয়েছিলেন একমাত্র জীবিত যাদব-বংশধর কৃষ্ণপৌত্র বজ্র। তাঁদের নিয়ে বিষাদাচ্ছন্ন মনে হস্তিনায় পৌঁছলেন অর্জুন।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব

মহাপ্রস্থানের পথে

অর্জুনের মুখে যাদববংশ ধ্বংসের বিবরণ শুনে মর্মাহত হলেন যুধিষ্ঠির। বিষণ্ণচিত্তে নতমস্তকে কি যেন চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ ধরে। তারপর মুখ তুলে ভাইদের বললেন তিনি: "এ পৃথিবীতে কালই সবচেয়ে শক্তিমান্—কালই বিনষ্ট করে সকল প্রাণীকে। কালই ধ্বংস করেছে যাদববংশ। আমাদের মৃত্যুর দিন আগতপ্রায়। আমার তাই ইচ্ছা: এ রাজ্যসম্পদ্ ছেড়ে, চল, মহাপ্রস্থান করি—সজ্ঞানে সশরীরে স্বর্গে যাই। তোমাদের কি মত?"

অন্য চার পাণ্ডবও যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একমত হলেন। তখন অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে অভিষিক্ত করা হল হস্তিনাপুরের সিংহাসনে, আর যুযুৎসুর উপর দেওয়া হল রাজ্যপালনের ভার, কৃষ্ণপৌত্র বজ্রকে বসান হল ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে।

তারপর পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী প্রচুর ধনরত্ন দান করলেন, ত্যাগ করলেন রাজবেশ ও সমস্ত আভরণ, বর্জন করলেন সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র। এর পর বৃক্ষবল্কল পরে উপবাস করে পূর্ব দিকে চলতে লাগলেন তাঁরা। একটা কুকুর আপনা থেকে তাঁদের পিছনে পিছনে যেতে লাগল।

বহু দেশ অতিক্রম করে লৌহিত্য সাগরের তীরে উপস্থিত হলেন পাণ্ডবেরা। সেখান থেকে তাঁরা দক্ষিণ দিকে গেলেন; তারপর লবণসমুদ্রের উত্তর তীর ধরে পশ্চিম দিকে এলেন এবং সমুদ্রজলে মগ্ন দ্বারকাপুরী দেখে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

হিমালয় পার হয়ে মরুভূমি ও মেরুপর্বত দর্শন করে তাঁরা এগিয়ে চললেন। এমন সময়ে পথশ্রমে ও উপবাসে অবসন্ন হয়ে দ্রৌপদী প্রাণহীন অবস্থায় ভূলুণ্ঠিতা হলেন।

দ্রৌপদীর এ অবস্থা দেখে ভীম প্রশ্ন করলেন যুধিষ্ঠিরকেঃ "দ্রৌপদী ত কোনদিন কোন অধর্মাচরণ করেননি। তবে কেন সশরীরে স্বর্গে যেতে পারলেন না তিনি ?"

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেনঃ "পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী হয়েও তিনি অর্জুনকে ভালবাসতেন বেশী; এজন্যই তাঁর পতন ঘটল।" উত্তর দিয়ে যুধিষ্ঠির আর দ্রৌপদীর দিকে ফিরেও তাকালেন না—শান্তমনে এগিয়ে চললেন।

কিছুক্ষণ পরে সহদেবও প্রাণ হারিয়ে ভূলুণ্ঠিত হলেন। ভীম আবার প্রশ্ন করলেন যুধিষ্ঠিরকেঃ "সহদেব কেন ভূপাতিত হলেন ?"

যুধিষ্ঠির বললেনঃ "সহদেব মনে করতেনঃ তাঁর মত বিজ্ঞ আর কেউ নেই; তাই পতন ঘটল ওঁর।"

আবার এগিয়ে চললেন সবাই। কিছুদূর যাবার পর নকুলও ভূপাতিত হলেন। আবার জিজ্ঞাসা করলেন ভীমঃ "কোন্ দোষে প্রাণ হারালেন নকুল ?"

যুধিষ্ঠির বললেনঃ "নকুল নিজেকে সবচেয়ে বেশী রূপবান্ মনে করতেন; তাই তাঁর পতন হল।"

এই বলে ভীমার্জুনকে নিয়ে এগিয়ে চললেন যুধিষ্ঠির। এবার পতন ঘটল অর্জুনের। তাঁর পতনের কারণও জানতে চাইলেন ভীম। যুধিষ্ঠির বললেনঃ "অর্জুন সর্বদা গর্ব করতেন যে, তিনি একদিনেই সমস্ত শত্রু বধ করবেন, কিন্তু তিনি তা পারেননি; তাছাড়া, ইনি অন্য ধনুর্ধরদের তুচ্ছজ্ঞান করতেন; এজন্যই তাঁর পতন ঘটল।"

ভীমও আর বেশী সময় চলতে পারলেন না। শীঘ্রই তিনি যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন : "মহারাজ, মহারাজ, দেখুন, আমারও পতন ঘটেছে। বলুন : কোন্ দোষে আমার এ দশা হল?"

যুধিষ্ঠির বললেন : "তুমি অত্যধিক ভোজন করতে, এবং অন্যের শক্তি না জেনেই নিজ শক্তির গর্ব করতে : তাই তোমার এ দশা হল।"

ভীমের দিকে আর দৃষ্টিপাত না করে যুধিষ্ঠির অগ্রসর হলেন। কুকুরটি তাঁর পিছন পিছন যেতে লাগল।

যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা

সঙ্গী কুকুরকে নিয়ে প্রশান্তচিত্তে এগিয়ে চলেছেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গের পথে। চার ভাই ও দ্রৌপদীর পতনে মন তাঁর ভারাক্রান্ত কিন্তু বিলাপ করার অবসর নেই। তাছাড়া, সকল মায়া-মোহের বাঁধন ছিঁড়েই স্বর্গে যেতে হয় : সুতরাং শোক করা অনুচিত।

সঙ্গী কুকুরটিকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন যুধিষ্ঠির—দূর থেকে দূরে, উচ্চ থেকে উচ্চে।

অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্র রথ নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন, বললেন : "যুধিষ্ঠির, এই রথে ওঠ। তোমাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য আমি এসেছি।"

"আমার ভাই চারজন ও দ্রৌপদীকে ফেলে কোন্ সুখে স্বর্গে যাব আমি?" বললেন যুধিষ্ঠির।

ইন্দ্র বললেন : "তাঁরা দেহত্যাগ করে তোমার আগেই স্বর্গে পৌঁছেছেন। সেখানে গেলেই তাঁদের দেখতে পাবে তুমি।"



এবার যুধিষ্ঠির তাঁর সঙ্গের কুকুরটিকে দেখিয়ে বললেন: 'আমাদের যাত্রার আরম্ভ থেকেই এ কুকুরটি আমাদের সঙ্গে আসছে। তাই আমি একেও আমার সঙ্গে স্বর্গে নিয়ে যেতে চাই।"

ইন্দ্র সবিস্ময়ে বললেন: "সেকি, যুধিষ্ঠির, কুকুর নিয়ে কি করে যাবে স্বর্গে! না-না, ওকে ছেড়ে তুমি চল আমার সঙ্গে।"

যুধিষ্ঠির বললেন: "দেবরাজ, এই কুকুরটি পরম ভক্তের মত আমার অনুগামী হয়েছে। একে ত্যাগ করলে অধর্ম হবে আমার। তার চেয়ে বরং স্বর্গে যাব না আমি।"

যুধিষ্ঠির এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটির মূর্তি বদলে গেল। কুকুর আর কেউ নয়—স্বয়ং ছদ্মবেশী ধর্ম!

ধর্ম বললেন: "বৎস যুধিষ্ঠির, তোমাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম আমি। তাই, কুকুরের ছদ্মবেশে তোমার সঙ্গী হয়েছিলাম। তুমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। তুমি যথার্থই ধর্মপ্রাণ—যথার্থই ন্যায়নিষ্ঠ। তুমি সশরীরে স্বর্গে যাবার যোগ্য।"

তখন আকাশে দুন্দুভি বেজে উঠল। দেবরথে চড়ে স্বর্গে গেলেন যুধিষ্ঠির। দেবতারা সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে।

স্বর্গারোহণপর্ব

কুরুপাণ্ডবাদির স্বর্গলাভ

স্বর্গে গিয়ে যুধিষ্ঠির দেখলেন : সেখানে সূর্যের মত দীপ্ত মূর্তি ধরে দেবতাদের মধ্যে বসে আছেন দুর্যোধন। এ দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন ধর্মরাজ। তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন : "দুর্যোধনের সঙ্গে বাস করব না আমি। পাঞ্চালীকে অপমান করেছে যে, যার জন্য বনবাসে বহু কষ্ট পেয়েছি আমরা, যার হঠকারিতা আর লোভের ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে সহস্র সহস্র স্বজনবন্ধু, তার মুখদর্শন করতে চাই না আমি।"

নারদ সহাস্যে বললেন : "এমন কথা বলবেন না, মহারাজ। স্বর্গে এলে কোন বিরোধ থাকে না। স্বর্গবাসী সকলেই দুর্যোধনকে সম্মান করেন ;—তিনি ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে স্বর্গে এসেছেন।"

যুধিষ্ঠির বললেন : "এই কুলক্ষয়কারী অধর্মাচারী স্বজনদ্রোহী দুর্যোধন যদি স্বর্গবাসের অধিকারী হয়, তবে কোথায় আমার মহাপ্রাণ মহাব্রত সত্যপ্রতিজ্ঞ ভ্রাতারা ? কোথায় আর সব কুরুপাণ্ডব বীর ? সেই সব মহারথ কি স্বর্গবাসের অধিকার পাননি ? আমি তাঁদের দেখতে ইচ্ছা করি। স্বর্গে আমার ভ্রাতাদের যদি স্থান না হয়ে থাকে, তবে আমিও থাকব না স্বর্গে। তাঁরা যেখানে আছেন, সেই স্থানই আমার স্বর্গ।"

তখন দেবতারা একজন দেবদূতকে আদেশ দিলেন : "যুধিষ্ঠিরকে তাঁর আত্মীয়বন্ধুদের কাছে নিয়ে যাও।"

সেই দেবদূত এক ভয়ঙ্কর পথ দিয়ে নিয়ে চললেন যুধিষ্ঠিরকে। সে পথ ঘোর তমসাচ্ছন্ন, পূতিগন্ধময়, গলিত মাংস ও শোণিতে এবং শবদেহে পরিপূর্ণ ; সে পথে সর্বত্র কৃমি, কীট ও হিংস্র প্রাণীরা

বিচরণ করছে, চতুর্দিকে অগ্নি জ্বলছে, প্রেতেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ; সেই পথের দুই পার্শ্বে অকথ্য শাস্তিভোগ করছে পাপাত্মারা। এ দেখে দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করলেন যুধিষ্ঠির : "আর কত দূর যেতে হবে এ পথ দিয়ে ? আমার ভ্রাতারা কোথায় ?"

দেবদূত বললেন : "মহারাজ, আপনি শ্রান্ত হয়ে ফিরতে চাইলেই আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব আমি—দেবতারা আমাকে সেই রকম আদেশ দিয়েছেন।"

যুধিষ্ঠির বললেন : "আমি আর তিষ্ঠাতে পারছি না এখানে-আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল।"

এই কথা বলতে না বলতে করুণ এক আর্তনাদ জাগল সেখানে : "হে ধর্মরাজ, হে রাজর্ষি, দয়া করে আরেকটুকু সময় থাকুন এখানে। আপনি এখানে আসাতে বাতাস সুগন্ধ হয়েছে, আমাদের যন্ত্রণারও উপশম হয়েছে, আপনাকে দেখে সুখী হয়েছি আমরা।"

চমকিত হয়ে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন : "আপনারা কে ? এখানে আছেন কেন ?"

তখন উচ্চকণ্ঠে উত্তর হতে লাগল : "আমি কর্ণ", "আমি ভীষ্ম", "আমি অর্জুন", আমি নকুল", "আমি সহদেব", "আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন", "আমি দ্রৌপদী", "আমরা দ্রৌপদীপুত্র"।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন যুধিষ্ঠির। তিনি ভাবতে লাগলেন : 'হায় হায়, কোন্ পাপের ফলে এঁরা এই পাপগন্ধময় নিদারুণ স্থানে আছেন ? আমি কি ঘুমচ্ছি, না জেগে আছি ? এ কি মায়া, না সত্য ?'

দুঃখে দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন দেবদূতকে : "তুমি যাঁদের দূত, তাঁদের কাছে গিয়ে বল তুমি যে, এই দুঃখার্ত স্বজনদের ছেড়ে আমি এখান থেকে যাব না।"

দেবদূত গিয়ে ইন্দ্রকে সব কথা জানালেন। কিছুক্ষণ পরেই ইন্দ্র,

ধর্ম ও অন্যান্য দেবতারা যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। অমনি অন্ধকার দূর হয়ে গেল; সে স্থানের পূতিগন্ধ দূরীভূত হল, বিভীষিকাগুলি মিলিয়ে গেল, পাপীদের আর্তনাদ স্তব্ধ হল; আর সুগন্ধে ভরে উঠল চারদিক।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন: "মহাবাহু যুধিষ্ঠির, ক্রুদ্ধ হয়ো না তুমি। আমাদের সঙ্গে এস। সকল রাজাকে নরক দর্শন করতে হয়। সকল মানুষেরই পাপপুণ্য থাকে। পাপ যার বেশী এবং পুণ্য অল্প, সে প্রথমে স্বর্গ ভোগ করে এবং পরে নরকে যায়; আর, পুণ্য যার বেশী, পাপ কম, সে প্রথম নরক ভোগ করে পরে স্বর্গে যায়। তুমি দ্রোণকে অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলে, তাই তোমাকে ছলক্রমে নরক দেখালাম। তোমার ভ্রাতারা ও দ্রৌপদী, তোমার পক্ষের সমস্ত নিহত বীরই স্বর্গে গেছেন। তুমিও স্বর্গে চল।"

এই বলে দেবরাজ যুধিষ্ঠিরকে আকাশগঙ্গায় স্নান করতে বললেন। স্নান করে দিব্যদেহ দিব্যভাব লাভ করলেন ধর্মরাজ। তারপর ইন্দ্রের সঙ্গে তিনি স্বর্গে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর ভ্রাতাদের, দ্রৌপদীকে, দুর্যোধনাদি সমস্ত কৌরবদের, আত্মপক্ষের ও বিপক্ষের সমস্ত নিহত বীরকে, পরলোকগত আত্মীয়স্বজনকে দেখতে পেলেন। সেখানে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি—হিংসা নেই, দ্বেষ নেই লোভ নেই! পবিত্র স্বর্গের প্রভাবে পবিত্র হয়েছে সকলের মন।

* * * *

শেষ হল জন্মেজয়ের যজ্ঞে বৈশম্পায়ন কর্তৃক মহাভারতের কাহিনী কথন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, প্রাচীন ভারতের অমর কাহিনী ব্যাস-রচিত মহাভারত সর্ববিধ জ্ঞানের আকর। মহাভারতে যা নেই, তা নেই ভারতে—তা নেই পৃথিবীতে।